উপাসক ও উপাস্যের মাঝে আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছার মাধ্যম। শায়খে কামেলও মুরিদ ও আল্লাহ্‌র মাঝে আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছার মাধ্যম। যেরূপ নবুওতের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিধি-বিধান সমূহের অনুসরণ ও ভালবাসা উম্মতের উপর পূর্ণ ফরজ। তদ্রুপ শায়খের নির্দেশনাকে ভালবাসা ও অনুসরণ মুরিদদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য। কেননা উহা ব্যতিত আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছার পথ অতিক্রম করা যাবে না। যেরূপ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা ও কাজ উম্মতের জন্য দলীল স্বরূপ। অনুরূপভাবে, শায়খের কথা ও কর্মও মুরীদের জন্য দলীল স্বরূপ।

কেননা দ্বীনের বুজুর্গগণ পীরের আমলকে মুরিদের জন্য ফিকহ শাস্ত্র গণ্য করেন। যেরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কেবলা। কোন পার্থক্য নাই যে, কামেল শায়খ; যিনি ফানা ও বাকা স্তর অতিক্রম করে মোশাহাদা (খোদার দর্শন) স্তরে পৌঁছেছেন তাঁরা মুরিদদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কেবলা। যেরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের জন্য শরীয়তের রূপক কেবলার হাকিকি কেবলা (প্রকৃত কিবলা)। অনুরূপভাবে, কামেল শায়খ মুরীদদের জন্য শরীয়তের রূপক কেবলার কেবলায়ে হাকিকি (প্রকৃত কিবলা)। যেরূপ এক্ষেত্রে নবীর জন্য স্তর বিবেচনায় সিজদায়ে তায়াব্‌বুদ (ইবাদতের জন্য সিজদা) নিষিদ্ধ ও শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরি। আর প্রকৃতপক্ষে মুতলাক (শর্তহীন) প্রকৃত সিজদা হাকিকতে নবীর জন্য সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে এখানেও শায়খের জন্য সিজদায়ে তায়াববুদ (ইবাদতের জন্য সিজদা) নিষিদ্ধ ও শরীয়তের দৃষ্টি কুফরি। আর প্রকৃতপক্ষে মুতলাক (শর্তহীন হাকিকি সিজদা) শায়খে হাকিকির জন্য সাব্যস্ত। উহা বুঝে নাও। কেননা ইহা অধিকতর সূক্ষ্ম মাসয়ালা। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

যখন তুমি পীরের জাতকে (সত্তা) কবুল করেছ,
তাঁর জাতে খোদা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অন্তর্ভূক্ত মনে কর।
যখন মানুষ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নুর (আলো) গ্রহণ করে,
তখন সে ফেরেশতা কর্তৃক সিজদা প্রাপ্ত হয়; কেননা সে নির্বাচিত।
অনুরূপভাবে সে সিজদা প্রাপ্ত হয় ঐ সমস্ত আত্মা দ্বারা যেগুলো ফেরেশতার
মতো বিভ্রান্তি ও সন্দেহমুক্ত।
নিজ অস্তিত্বকে ফানা (লীন) করে দেওয়া ব্যক্তিদের সকাশে আকাশ,
সূর্য ও চন্দ্র মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়।

আল্লামা বাহরুল উলুম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মসনবী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন-'মানুষ যখন নুর (জ্যোতি) ধারণ করে। (অর্থাৎ) মানব যখন আল্লাহ তায়ালার মা'রেফতের নুর, তাঁর নাম ও গুণাবলী থেকে প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেন, তখন তিনি মনোনীত হওয়ার ও বুজুর্গীর কারণে সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে ফেরেশতাদের সিজদার যোগ্য পরিণত হয়। বরং কোন মানব সন্তান যিনি মানবীয় গুণাবলী থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন এবং ফেরেশতাদের মত হয়ে গেছেন, তিনিও সিজদার যোগ্য পরিগণিত। মসনবী শরীফের অপর একটি স্থানে উল্লেখ আছে-

কবিতা

নির্বোধরা মসজিদের সম্মান করে,
কিন্তু অন্তরাত্মার অধিকারী (আউলিয়া) ব্যক্তিদের উপর যুলুম করে।
কা'বা[১] আজরের ছেলে হযরত ইব্রাহীম খলিল (আলাইহিস্সালাম) কর্তৃক নির্মিত ঘর,
অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর বড় মহাত্ম্যের অধিকারী।
হে গাধা! ঐ প্রকাশ্য মসজিদ রূপক, আর এই পূর্ণ মানব হাকিকত (বাস্তব প্রকাশ),
পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর ছাড়া মসজিদ অন্য কোথাও নাই।
আউলিয়াদের অন্তর্নিহিত চেতনায় মসজিদ অবস্থিত,
এটা সকলের সিজদার স্থান এবং সেখানে রয়েছে খোদার অবস্থান।
যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার আউলিয়াদের অন্তর কষ্ট পাবে না,
ততক্ষণ আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করবেন না।
তারা (কাফিররা) নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল,
তারা নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম) বাহ্যিক আকৃতি দেখেছিল, তারা মনে করেছিল নবীগণ (আলাইহিমুস্সালাম) তাদের মত মানুষ।

---

[১] আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আমি ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে পবিত্র রাখ।" (সূরা বাকারা: ১২৫)। হযরত শায়খ আকবর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় তাফসিরে লিখেন-যার অনুবাদ হল এই যে, আমি তাঁদেরকে আদেশ করলাম অন্তরের ঘরকে (ক্বলব) নফ্সের ময়লা, শয়তানী প্ররোচনার অপবিত্রতা এবং প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্যের অপবিত্রতা থেকে তাওয়াফকারীদের জন্য যেন পবিত্র করে। অর্থাৎ অনুরাগী সালেকদের জন্য; যাতে তারা স্বীয় পরিভ্রমনে প্রশান্ত অন্তরে ঘুরতে পারেন। শেষে উক্ত শায়খ নিম্নোক্ত আয়াত-"অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে বাঁধা দান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেজগার। কিন্তু অধিকাংশ সে বিষয়ে অবহিত নয়।" (সূরা আনফাল: ৩৪)। ইহার তাফসিরে বলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ হল ক্বলব (অন্তঃকরণ) এর প্রতিচ্ছবি। কেননা, প্রকৃত বায়তুল্লাহ হল উহাই (ক্বলব)। সেই জন্য উহার (বায়তুল্লাহ) অধিকারের হকদার হলেন পরহেযগারগণ অর্থাৎ একত্ববাদীদের জন্য সাব্যস্ত। ইহা মুশরিকদের জন্য নয়। [সূরা আনফাল, পৃঃ-১২৮, খন্ড-২)।

আল্লামা বাহরুল উলুম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- 'দেহ বিশিষ্ট দেখেছি'। যেমন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথার বর্ণনা দেন। আল্লাহ্‌র বাণী, "তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।" (সূরা ইয়াসিনঃ ১৫)। অর্থাৎ কাফেরগণ বলত যে, নবীগণ (আলাইহিস্‌সালাম) আমাদের মত মানুষ। তাঁরা নিদ্রা যায় ও পানাহার করে। এই লোকেরা কেমন করে নবী হবে? আর তারা ইহা বুঝে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত নাম ও গুনাবলীসহ তাঁদের (নবী) মধ্যে দীপ্তমান। মসনবী শরীফের তৃতীয় মকামে বলেন–

মসনবী

সুতরাং ইব্রাহীম আদহাম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,
তিনি ভ্রমণ শেষে বিশ্রামের জন্য একটি সমুদ্রের ধারে বসেছিলেন।
যখন সেই আধ্যাত্মিক সুলতান চাদর সেলাই করছিলেন,
হঠাৎ একজন আমির তথায় এসে উপস্থিত হলেন।
ঐ আমির শায়খের দাসদের একজন ছিলেন,
তিনি (আমির) শায়খকে চিনতে পারলেন এবং সাথে সাথে সিজদা করলেন।
সে (আমির) শায়খের খেরকা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন,
তাঁর স্বভাব এবং বাহ্যিক বেশভূষা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।
বিস্ময়কর যে, তিনি এত বিশাল রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন এবং সেই অতিক্ষুদ্র
আধ্যাত্মিক ফকিরী বেছে নিয়েছিলেন।
তিনি সাত সাম্রাজ্যের রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন
এবং ফকিরের মত তাঁর দরবেশী খেরকায় সূঁচ ঠেকিয়েছিলেন (অর্থাৎ পোশাক সেলাই করছিলেন)।
সাত সাম্রাজ্যের রাজত্ব ত্যাগ করে তিনি ফকিরের মত দরবেশী খেরকায় সূঁচ ঠেকিয়েছিলেন।
শায়খ তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন,
একজন শায়খ সিংহের মত এবং মানুষের হৃদয় তাঁর জঙ্গল।
শায়খ দ্রুত তাঁর সূঁচটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন
এবং উচ্চ স্বরে সূঁচকে ডাকলেন।
শত সহস্র খোদায়ী মাছ-ভেসে উঠল,
প্রতিটি মাছের ঠোঁটে সোনার সুঁচ বিদ্যমান।
খোদায়ী সমুদ্র থেকে তাদের মাথা তুলে বলল,
হে শায়খ! খোদায়ী সূঁচ গ্রহণ করুন।
তিনি তার (আমির) দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,

হে আমির! হৃদয়ের (আত্মা) রাজত্ব উত্তম, নাকি এমন ক্ষুদ্র রাজত্ব (অস্থায়ী) উত্তম (যেটি আমি এক সময় অধিকার করেছিলাম)?
যখন ঐ আমির শায়খের হুকুম বাস্তবায়ন হতে দেখলেন,
মাছ যখন তাঁর ডাকে সাড়া দিল, তখন তাঁর (আমির) ওজ্‌দ (প্রেম-বিভোরতা) চলে আসল।
তিনি (আমির) বললেন, আহ্! মাছ পীরদের চেনে,
ধিক্কার সে ব্যক্তির উপর যে তাঁর (খোদা) দরবার থেকে বহিষ্কৃত।
মাছের কাছে পীরের জ্ঞান আছে, আর আমরা তাঁর থেকে দূরে,
আমরা এই সম্পদের (সৌভাগ্য) অভাবে দূর্ভাগা এবং তারা (মাছ) এটি উপভোগ করে আনন্দিত।
তিনি (আমির) সিজদা করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে নিভৃতে চলে গেলেন,
খোদা মিলনের ইশকে তিনি পাগল হয়েছিলেন।
অতঃপর, হে অপবিত্র মুখ! তুমি কিসের সাথে ও কার সাথে লড়াই করছ এবং ঈর্ষা করছ?
তুমি সিংহের লেজ নিয়ে খেলছ,
তুমি ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছ।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! উপরের বর্ণনা থেকে তোমার পরিষ্কার জানা হল যে, কা'বার প্রকৃত কেবলা এবং কা'বার কা'বা হল দিলওয়ালাদের (আল্লাহওয়ালা) অন্তর। অতএব, রূপক কা'বাতে যা কিছু বিধি-বিধান বলবৎ আছে এবং মেনে চলা হয় তার চেয়ে বেশী দিলওয়ালাদের (আল্লাহওয়ালা) অনুসরণ করা উচিত। মুজিবের উস্তাদগণ বলেন-

কবিতা

দুনিয়াবাসীদের জন্য কা'বা হল হারাম শরীফ।
হে মুজিব (সাড়াদানকারী)! আর আশেকদের জন্য আল্লাহ্‌র ঘর অন্যটি।

হযরত মাওলানা জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) "নফহাতুল উনস" গ্রন্থে হযরত আবউয়াই মগরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর অবস্থাদির ব্যাপারে 'ফতুহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেন, যার অনুবাদ এই যে- লোকেরা বরকত ও সম্মানে শায়খ আবু মুদীন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর হস্তে চুম্বন কেন করেন? এই ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কি আপনার নিজের মধ্যে এর কোন প্রভাব পেয়ে থাকেন? তিনি উত্তর দিলেন, হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) তার নিজের মধ্যে কি কোন প্রভাব পায়; যা ইহাকে তার পাথর সত্তা থেকে বের করে এনেছে? তা সত্ত্বেও উহাকে নবীগণ, আউলিয়াগণ এবং সমস্ত মুসলমানগণ চুম্বন করে। ইহা কি বলবে না? তিনি

(আবু মুদীন রহমতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, আমি ঐ হাজরে আসওয়াদ এবং উহার হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। তাই, আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মসনবী শরীফের ২য় দপ্তরে হযরত সুলতানুল আরেফীন বায়েজিদ বুস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর কা'বা শরীফ গমন এবং একজন বুজুর্গের খেদমতে গমন করার বর্ণনায় বলেন-

মসনবী

উম্মতের শায়খ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মক্কার দিকে যাত্রা করলেন,
যাতে তিনি হজ্ব ও ওমরা পালন করবেন।
তিনি যে শহরে যেতেন তিনি প্রথমে প্রিয় দরবেশদের খোঁজ করতেন।
তিনি ঘুরে বেড়াতেন ও জিজ্ঞাসা করতেন,
'শহরে এমন কে আছে যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে'?
আল্লাহ বলেন, তুমি যেখানেই ভ্রমণে যাওনা কেন,
তোমাকে প্রথমে একজন পবিত্র লোকের খোঁজ করতে হবে।
গুপ্তধনের সন্ধানে যাও, কারণ জাগতিক লাভ-ক্ষতি দ্বিতীয় স্তরের,
এগুলোকে শাখা হিসেবে বিবেচনা কর (মূল হিসাবে নয়)।
যখন হজ্বের মৌসুম হয়, তখন কাবার সন্ধানে যাও,
যখন তুমি ঐ উদ্দেশ্যে যাবে তখন মক্কারও দর্শন লাভ করবে।
মিরাজ (উর্ধগমণ) রজনীতে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য ছিল প্রেমাস্পদের দর্শন,
তবে তাঁকে আরশ ও ফেরেশতাদেরও দেখানো হয়েছিল।
হযরত বায়েজিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কা'বায় গমনের সময় তাঁর সময়কার খিজির (আলাইহিস্সালাম) কে খুঁজে বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি অমাবস্যার চাঁদের মত কুঁজো এক বৃদ্ধ লোককে দেখেছিলেন,
তিনি তাঁর মধ্যে পবিত্র পুরুষদের মহিমা এবং উচ্চাঙ্গের কথা-বার্তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
তাঁর চোখ দৃষ্টিহীন এবং তাঁর হৃদয় সুর্যের মত আলোকিত ছিল
যেন হিন্দুস্থানের স্বপ্নের এক হাতির মত।
চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে তিনি দেখছিলেন শত আনন্দ; যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন সেসব আনন্দ দেখতে পান না,
বলে উঠলেন, কি বিস্ময়কর!
ঘুমের মধ্যে অনেক বিস্ময় প্রকাশ পায়,
ঘুমের মধ্যে হৃদয় একটি জানালায় পরিণত হয়।

যিনি জেগে আছেন এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখেন তিনিই খোদাকে জানেন,
তাঁর ধূলো তোমার চোখে মেখে নাও।
বায়েজিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তাঁকে আক্‌তাব হিসেবে পেলেন,
সেখানে অবস্থান করেন এবং তাঁর খেদমতে লেগে গেলেন।
তিনি [বায়েজিদ (রঃ)] তাঁর সামনে বসে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন,
তাঁকে তিনি একজন দরবেশ এবং পরিবারভুক্ত পেলেন।
তিনি (বৃদ্ধ লোকটি) বললেন, হে বায়েজিদ! তুমি কোথায় যাচ্ছ?
তুমি সফরের মালপত্র কোন দেশে নিয়ে যাচ্ছ?
বায়েজিদ উত্তর দিলেন, 'আমি ভোর বেলায় কা'বার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি',
অন্যজন চিৎকার করে বললো, 'তোমার কাছে রাস্তার কি পাথেয় আছে'?
তিনি বললেন, 'আমার কাছে দুইশত রূপার দিরহাম আছে;
দেখ, এগুলো আমার চাদরের কোণে শক্ত করে বাঁধা আছে'।
তিনি বললেন, আমার চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ কর
এবং এটাকে কা'বার তাওয়াফের চেয়ে উত্তম মনে কর।
এবং সেই দিরহামগুলো আমার সামনে রাখ,
হে উদার! জেনে রেখো যে, তুমি হজ্ব করেছ এবং ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।
তুমি ওমরা করেছ এবং অনন্ত জীবন লাভ করেছ,
তুমি পবিত্র হয়েছ এবং সাফা (পবিত্রতা) পাহাড়ে সাঈ করেছ।
তোমার প্রাণ যাঁকে দেখেছে সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে,
তিনি আমাকে তাঁর ঘরের জন্য মনোনীত করেছেন।
কা'বা যদিও তাঁর ঘর- আমার সৃজিত রূপও তাঁর (আল্লাহ) গুপ্ত রহস্যের ঘর।
যখন তুমি আমাকে দেখেছ, তখন তুমি আল্লাহকে দেখেছ,
তুমি আন্তরিকতার সাথে কা'বাকে প্রদক্ষিণ করেছ।
আমার সেবা করা মানে খোদার আনুগত্য করা এবং খোদার প্রশংসা করা,
সাবধান! খোদাকে আমা থেকে পৃথক মনে করবে না।
তোমার চোখ ভাল করে খুলে আমার দিকে তাকাও,
যাতে তুমি মানুষের মধ্যে খোদার নুর দেখতে পাবে।
হে বন্ধু! কা'বাকে তিনি (আল্লাহ) একবার বলেছিলেন, 'আমার ঘর',
তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে আমার বান্দা সত্তর বার।
হে বায়েজিদ! তুমি কা'বা পেয়েছ-তুমি সৌন্দর্য,
সম্মান ও মহিমা খুঁজে পেয়েছ।
বায়েজিদ সেই রহস্যময় কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিলেন
এবং সোনার বালির মত কানে লাগিয়ে দিলেন।

তাঁর (বৃদ্ধ লোক) মাধ্যমে বায়েজিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করলেন, আর আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করলেন।

আল্লামা বাহরুল উলুম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) "শরাহ"গ্রন্থে বলেন- ইহা ঐ কারণে যে, ইনসানে কামেল (পূর্ণমানব) এর প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তার সত্তা, নাম ও গুনাবলী সমূহের সমস্ত স্তর সমূহকে সমাবেশকারী। এই আবস্থায়, মানব খোদার গোপন রহস্যের আঁধার। হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, "মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য।" অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য এবং মানুষ আমার গোপন রহস্য। মানুষ আমার প্রকাশ এবং আমি তার (মানুষ) গোপন রহস্য। আর কামেল আরেফ (পূর্ণ মা'রেফত সমপন্ন ব্যক্তি) এর কাছে এই উভয় মোশাহেদা (দর্শন স্তর) হাসেল আছে। কেননা, তাঁরা কখনো আল্লাহকে অপ্রকাশ্যভাবে দেখে এবং নিজেকে প্রকাশ্যভাবে দেখে। আবার কখনও নিজেকে অপ্রকাশ্য পায় এবং আল্লাহকে প্রকাশ্য পায়।

কবিতা

নিজেকে যখন তুমি তোমার মধ্যে খুঁজবে, তুমি আমাকে (আল্লাহ) পাবে,
কে কোথায় খুঁজে পেয়েছে লীনপ্রাপ্ত এর অস্তিত্ব?
যখন আমি নিজেকে খুঁজলাম, তখন বাস্তবিকই নিজেকে পেলাম,
আমি তোমাকে পেলাম ব্যক্ত ও গুপ্তে।

কাহিনিটিতে হাদিসে কুদসীর দিকে ইঙ্গিত করছে। ইরশাদ করেন, "আমার জমিন ও আসমান আমার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু আমার মুমীন বান্দার ক্বলব (অন্তর) আমার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে"। অতএব, প্রকাশিত হয়ে গেল যে, যখন পূর্ণ মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জাতে ফানা এবং আল্লাহ্‌র জাতে বাকা লাভ করে, তখন সমস্ত সঞ্চালন ও স্থিরতা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিতার্থ হয়ে যায়। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, "আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। আমি তার জিহবা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে কথা বলে"। যখন সে (বান্দা) উক্ত গুণাবলী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যায়, তখন তাঁর আনুগত্য ও ভালাবাসা আল্লাহ্‌র মূল আনুগত্য ও বন্ধুত্ব হিসেবে গণ্য হয়। যেমন হাদিসে কুদসীর ভাষ্য থেকে বুঝা যায়। উহা হল এই-"তুমি আমার গুণাবলী সমেত আমার সৃষ্টি জীবের কাছে বের হয়ে যাও। যে ব্যক্তি তোমাকে দেখল, সে যেন আমাকে দেখল। যে ব্যক্তি তোমাকে ইচ্ছা করল, সে যেন আমাকে ইচ্ছা করল। যে ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসল, সে যেন আমাকে ভালবাসল।"। [ইনসানে কামেলকে] সিজদা করা হল সম্মানসূচক সিজদা। উহার অভ্যন্তরে

খোদা তায়ালার আনুগত্যও পাওয়া যায়। যেমন আদম (আঃ) এঁর জন্য ফেরেশতাদের সিজদা। হাফেজ সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

যখন আমি স্বীয় চেহারা দেখলাম, সিজদা করলাম,
আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, আজ রাতে আমি কল্যাণ লাভ করেছি।

পংক্তি

হাফেজ সিরাজী যদি তোমাকে সিজদা করে তবে কোন দোষ নেই,
কেননা, হে প্রেমাসম্পদ! ইশকের কুফরিকারীর কোন পাপ হয় না।

পংক্তি

হে হাফেজ! তাঁর ভ্রুর বেদীতে সিজদা কর,
কারণ তুমি বন্ধুর ভ্রু ছাড়া অন্য কোন বেদীতে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে পারবে না।

মসনবী শরীফে আছে-

মসনবী

অভিশপ্ত ইবলিশের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের দিকে তাকাবে না,
তাঁকে মাটির সাথে নিসবত করিও না।
খাজাকে (প্রেমাস্পদ) প্রাণ বা আত্মা মনে কর, তাঁকে স্থুল দেহ মনে করো না,
তাঁকে মগজ (মজ্জা) মনে করো, তাঁকে অস্থি মনে করো না।
মনে করো না যে খাজা; যিনি উচুঁ আসমান অতিক্রম করেছেন,
তিনি অন্ধকারের এই ইঁদুর গুলির সমজাতীয় হবেন।
যেহেতু, দৃষ্টির ভ্রমের কারণে তুমি খাজাকে খোদা থেকে ভিন্ন মনে করেছ,
হে দ্বৈত দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ! আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বাদশাহর সামনে লজ্জিত হও।
সূর্যের সহযাত্রীকে বাদুড় বলবে না- যাকে সিজদা করা হয়েছে,
তাকে সিজদাকারী বলবে না।
এই (খাজা) অন্যান্য প্রতিবিম্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিবিম্ব নয়, ইহা প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যে খোদার অস্তিত্বের বিকাশ।
সে সূর্য দেখেছিল এবং কঠিন পদার্থ হয়নি,
গোলাপ ফুলের তৈল তিলের তেলের সাথে মিশ্রিত ছিল না।
যেহেতু খোদার আবদালগণ স্থানান্তরিত হয়েছেন,
তাঁরা মখলুক (সৃষ্টিজীব) এর মধ্যে গণ্য নয়, তাঁদের জন্য নতুন অধ্যায় রচনা কর।
কিভাবে একত্ববাদের কিবলা দুই হয়?
ফেরেশতাদের সিজদাকৃত মাটির মানব কেমন হওয়া উচিত?
স্থুল দেহ মনে করো না। বধির ও বোবার মত আচরণ করিও না,

তিনি (দঃ) তাদের (কাফির) কাছে সত্য নিয়ে আগমন করলেন, তখন কাফিররা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

বাহারুল উলুম এর 'শরাহ' গ্রন্থে রয়েছে- তাঁর বাণী- 'তুমি নিরেট দেহ মনে করিও না'। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র আবদালকে নিরেট দেহ মনে করিও না এবং মাটির দেহকে পাতলা মনে করিও না। আর নিজের জানকে তাঁদের অস্বীকারের ব্যপারে বলিও না। যেরূপ কাফিরগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অস্বীকার ও মিথ্যারোপ করার ব্যপারে নিজেদের জান (প্রাণ) কে বলত। যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর ছুরত (আকৃতি) এ বিকশিত হয়ে তাদের (কাফির) পাশে আসলেন। হে প্রিয় বন্ধুগণ! নিম্নোক্ত আয়াত, আল্লাহ্‌র বাণী- "তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও"। এই আয়াতের মর্ম মতে স্বীয় মুর্শিদে কামেলের এক মুহূর্তের সাহচর্য ও খেদমত এবং তাঁর প্রেম-ভালবাসায় ফানা হয়ে থাকা সালেক (খোদা পথচারী) ও প্রকৃত মুরীদের জন্য একশত বছরের ইবাদত, আনুগত্য, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত থেকে উত্তম। মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

আউলিয়াদের সাথে এক মুহূর্তের সাহচর্য একশত বছরের রিয়াহীন (প্রদর্শনেচ্ছাহীন) ইবাদত হতে উত্তম।

গ্রন্থকার বলেন-

পংক্তি

শত নামাজ ও রোজা নিঃসন্দেহে অনেক উত্তম,
তোমার কোঁকড়া চুলের স্মরণ আমাকে ইশকে মাতাল করে দিয়েছে।

খাজা আহরার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) **বলেন-**

পংক্তি

প্রকৃতপক্ষে নামাজের কাযা আদায় করা যায়।
কিন্তু আমাদের ছোহবতের (সাহচর্য) নামাজকে কাযা পড়া যায় না।

হাদিসের মধ্যে এসেছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বসতে চায়, সে যেন সূফীদের সাথে বসে'।

কবিতা

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বসতে চায়, সে যেন আউলিয়াদের বৈঠকে বসে।

অন্য একটি হাদিসে ইরশাদ করেন, 'ফকিরগণ (আউলিয়াগণ) আল্লাহ্‌র সাথে সহাবস্থানকারী। তাঁদের সাথে বৈঠককারীগণ কখনো দূর্ভাগা হয় না'। একটি বিশুদ্ধ হাদিসে ইহা ইরশাদ হয়েছে- 'তাঁরা ঐ সব লোক যখন তাঁদের

প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়'। হযরত জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'নফহাতুল উনস' গ্রন্থে স্বীয় পীর-মুরশীদ হযরত খাজা ওবাইদুল্লাহ আহরার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর অবস্থাদি সম্পর্কে লিখেন যে, মুরিদের উচিত পীরের ইচ্ছার আগুনে জ্বলে যাওয়া এবং নিজের উদ্দেশ্যবলী থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে অন্তরের চক্ষু দ্বারা পীরের সৌন্দর্য্যের আয়নায় স্বীয় উদ্দেশ্যবলী সমূহকে অবলোকন করবে। স্বীয় সাহসপূর্ণ চেহারাকে সমস্ত কেবলা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে পীরের সৌন্দর্য্যের কেবলার দিকে মুখাপেক্ষী হবে। আর পীরের আনুগত্যে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে মস্তককে পীরেরই আস্তানায় ঝুঁকে রাখবে এবং পীরের কাছে কবুল হওয়াকে নিজের সৌভাগ্য জানবে। আর পীরের কাছে প্রতাখ্যাত হওয়াকে নিজের দূর্ভাগ্য জানবে। বরং অস্তিত্বহীনতার বিষয়টাকে স্বীয় অস্তিত্বের ললাটে টেনে নেবে। পীর ভিন্ন অন্য কারো খেয়াল থেকে মুক্তি লাভ করবে।

পংক্তি

যে পার্থিব দুনিয়া থেকে মুক্ত হল,
সে পার্থিব দুনিয়ার টিউলিপ ফুলের বাগান দেখেও পেরেশান।

বাইশতম মকামের চাহিদা অনুসারে, যিনি জাহের ও বাতেন জ্ঞানের সমাবেশকারী হযরত শরফুদ্দিন আহমদ সাহী মুনিরীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখিত বিষয়কে এই স্থানে লিখে দেওয়া উচিত মনে করা হল। সেই জন্য উহার অনুবাদ সারমর্ম আকারে এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হল। তা হল- বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম [আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় দয়ালু]। ভাই, শামসুদ্দিন (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিরাপদে রাখুন) বলেন- জানা উচিত যে, হজ্বে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত উভয়টি রয়েছে। আশেকগণের কাছে হজ্বের মধ্যে অনেক রহস্যাদি লুকায়িত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত কা'বার যিয়ারতকারীগণ আল্লাহ তায়ালার যিয়ারতকারী। আর যিয়ারতকারীর সম্মান করা খোদার জন্য কর্তব্য। কা'বা ঘরের হজ্ব দ্বারা খোদা তালাশকারীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল কা'বা ঘরের খোদা। উক্ত কা'বা ঘর নয়। কিন্তু উভয়ের (খোদা ও বান্দা) মধ্যে কা'বা ঘর একটি বাহানা মাত্র। রাহবারে (পথ প্রদর্শক) কামিল শায়খের সত্তা খোদা তালাশকারীর জন্য প্রকৃত উদ্দিষ্ট কা'বা। ফানা ফিশ শায়খ (আপন পীরে বিলীন হওয়া) এর মরতবা (স্তর) অর্জনই হল ফানা ফিল্লাহ (আল্লাহতে বিলীন হওয়া) এর মর্মার্থ ও উদ্দেশ্যের মূল কথা। হযরত সুলতান মাহবুবে সোবহানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

তোমার জন্য বছরে একটি হজ্ব,
আমাদের প্রেমাস্পদের গলিপথে প্রদক্ষিণ করা আশেকদের প্রতি মুহূর্তের হজ্ব।
কা'বার তওয়াফ কর, হে হাজি! আমাকে তাঁর (প্রেমাস্পদ) গলিতে ছেড়ে দাও,
কেননা প্রেমাস্পদের গলিপথে তাওয়াফ করা হজ্বে আকবর (বড় হজ্ব)।

'রিসালায়ে কুদসীয়া' গ্রন্থে হযরত লিসানুত্তাসাউফ আবু সাঈদ আহমদ আল হাররাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন-সায়ের এলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে বান্দার গতি) ঐ সময় পূর্ণ হয়, যখন সালেক (খোদাপথচারী) স্বীয় সাধারণ স্তর ও কুপ্রবৃত্তির অংশ সমূহ থেকে পরিপূর্ণ বের হয়ে আসবে। আর খোদা তালাশের পথে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে বিশুদ্ধ মনোযোগ সৃষ্টি করবে। আর খোদা তালাশের পাত্রটিকে সততার পদক্ষেপ দ্বারা পরিপূর্ণ অতিক্রম করে নিবে, যাতে খোদা মিলনের কা'বা পযর্ন্ত পৌঁছে যাবে।

কবিতা

তোমার দিকে, হে আমার হজ্ব ও ওমরার সমাপ্তি।
অবশ্যই হজ্ব একটি সম্প্রদায়ের কাছে মাটি ও পাথরই।

হযরত সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর বাণী- একবার আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে সম্মানিত কা'বার হেরম শরীফে গমন করি এবং কা'বার সৌন্দর্য দর্শন করি। স্বীয় অন্তরে চিন্তা করলাম যে, আমি স্বীয় জীবনে এই প্রকারের অনেক আরো ঘর দেখেছি। আমার কাছে ঘরের মালিক দরকার। ইহা বলে তিনি (বায়েজিদ রহমতুল্লাহে আলাইহি) সেখান থেকে ফিরে এলেন। বাহ্যিক দৈহিক আকৃতির দিক থেকে শায়খে কামেল (কামেল পীর) একটি মাটির মূর্তি মনে হয়। এই প্রকারের অনেক মাটির পুতুল তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। সত্য অনুসন্ধানীর কাছে শায়খের আধ্যাত্মিক মর্মার্থ প্রয়োজন। সুলতানুল আরেফিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- আমি দ্বিতীয় বছর পুণরায় কা'বার হেরেম শরীফে পৌঁছলাম। অন্তরের চক্ষু খুলে গেল। কা'বা ঘরের খোদার দর্শনের সৌভাগ্য দ্বারা সম্মানিত হলাম। অন্তরে উদয় হল- খোদায়ী জগতে শিরক (অংশিদার) এর কোন অবকাশ নাই। একত্ববাদের জগতে দুই সত্তার কিভাবে সমাবেশ হতে পারে? প্রেমাস্পদ, কা'বা ঘর ও আমি তিনটি বস্তু, যে এগুলোকে দুই দেখে সে নাস্তিক। আর যে তিন দেখে সে কি করে নাস্তিক হবে না? ইহা বলে তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। সত্য অনুসন্ধানী কাছে স্বীয় (কামেল পীর) পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস অন্তরে এসে যাওয়ার পর অন্তরের চক্ষু সমূহ দ্বারা স্বীয় শায়খ (পীর) কে প্রকৃত প্রেমাস্পদ থেকে পৃথক কল্পনা করা শিরক ও খোদার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

তুমি দুই জানিও না, দুই দেখিও না এবং দুইয়ের অনুসন্ধানী হয়ো না,
তুমি তাঁর (পীরে কামিল) সত্তাকে খোদার সত্তায় বিলীন মনে কর।
যদি তুমি পীরে কামেলকে খোদা থেকে আলাদা দেখ,
তবে হাকিকতের মূল রহস্য হারিয়ে ফেলবে।
পীরে কামেলকে যে দুই দেখেছে সে পথভ্রষ্ট হল,
এবং সে প্রকৃতপক্ষে মুরীদ হল না।
নবী (আঃ) ও আউলিয়াদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) সত্য মনে কর,
তাহলে তোমার কাছে গুপ্ত রহস্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।
মানবের মধ্যে সূর্য (পীরে কামেল) ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে,
ইহা অনুধাবন কর, আল্লাহ সঠিক বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় বছর তিনি (বায়েজিদ রহমতুল্লাহে আলাইহি) পুণরায় কা'বা ঘরের হেরেম শরীফে পৌঁছেন। প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ নিজ অবস্থাকে শামিল করে নিল। সম্মানের পর্দা দর্শনের চক্ষু থেকে উঠিয়ে নিলেন। মা'রেফতের আলোকবর্তিকা অন্তরে আলোকিত হল এবং আমার হাস্তিকে (আমিত্ব) নুরের তজল্লী (দ্যুতি) দ্বারা একেবারে জ্বালিয়ে দিল। আর এই সম্বোধন আমার চেতনার কর্ণে পৌঁছল- 'তুমি আমার প্রকৃত যিয়ারতকারী। অতএব, যার যিয়ারত করা হয় তাঁর উপর আবশ্যক যে, যিয়ারত কারীকে সম্মান করা'। অর্থাৎ তুমি আমার প্রকৃত যিয়ারতকারী। তোমার সম্মান আমার জন্য ওয়াজিব ও আবশ্যক।

পংক্তি

যখন আমার দৃষ্টি শক্তি প্রসারিত করলাম, তখন তোমার চেহারার নূরী তজল্লি প্রত্যক্ষ করলাম- আর যখন শ্রবণ শক্তি প্রসারিত করলাম, তখন তোমার আওয়াজও শুনতে পেলাম।

প্রকৃত প্রেমিকদের জন্য নিরাকার জাত বা সত্তার ঘরের সৌন্দর্যেরই নেশা। কেননা, উহা দ্বারা নিজেদের অন্তরে শান্তনা প্রদান করে। ধর্মীয় বুজুর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন বন্ধুর নিশানা বা বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন দ্বারা সে শান্তনা খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে প্রেমাস্পদের নিদর্শন দ্বারা অস্থির হৃদয়ে শান্তনা বা শক্তি পেয়ে থাকে। মজনু লায়লার বিচ্ছেদে লায়লার গলি পথে সকাল সন্ধ্যা পরিভ্রমন করতঃ দরজা প্রাচীর চুম্বন করত এবং ইহা বলত-

কবিতা

আমি লায়লার ঘরের প্রাচীর প্রদক্ষিণ করি,

আমি উক্ত ঘর সমূহ এবং প্রাচীর সমূহকে চুম্বন করি।
অথচ ঘরের ভালবাসা আমার হৃদয়কে প্রণয়াসক্ত করেনি,
কিন্তু উক্ত ঘরে যে বসবাস করে তার ভালবাসা প্রণয়াসক্ত করেছে।

অত্যধিক প্রেমাকূল আশেকগণ যাচনাকারী কপালকে গর্বিত প্রেমাস্পদের আস্তানায় সর্বদা ঘঁষতে থাকেন। আর অন্তরের ব্যাথা, অন্তর্জ্বালা, অন্তরের দহন ও গলনে দিন-রাত কান্না করতে থাকে। যাতে ভূমিকা ও মূলকথা দ্বারা উপস্থিত মর্মার্থে পৌঁছানো যায়। আর প্রেমাস্পদের বৈশিষ্ট্য দ্বারা চাক্ষুষ দর্শনের সম্পদ দ্বারা সুশোভিত হবে। যখন বান্দা পরিবার-পরিজন, গৃহ সামগ্রী, দেশ ও সম্পদ থেকে দয়া ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ প্রচেষ্টা ও সাধনা, সীমাহীন হতাশা ও কষ্টের পর শায়খকে (পীর কামেল) দেখেন; যিনি উদ্দিষ্ট কা'বার সৌন্দর্য। সেই সময় নিজের অন্তরে এমন আনন্দ পেয়ে থাকেন যে, ইহার বিপরীতে সমস্ত আনন্দ সমূহ পীড়াদায়ক মনে হয়। যদি এই অবস্থায় সাহায্যের কোমল হাওয়া এসে পৌঁছে এবং তার আমিত্বের আবরণকে উঠানো হয়, দর্শনের চোখ তার অন্তরের সিংহাসন স্বচ্ছ মঞ্জিলে গিয়ে থামেন। আর পবিত্র নৈকট্যপূর্ণ সম্মানিত আরশের চতুর্দিকে অন্তর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতে থাকে। সেই সময় এমন আনন্দ তার কাছে পৌঁছে, যার তুলনায় বেহেশতের আনন্দকে আনন্দই বলা যায় না। হফেজ শামসুদ্দিন বুলবুল সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

বন্ধু চেহারার ছবি আমরা ইশকের পেয়ালায় দেখেছি,
স্থায়ী শরাবের স্বাদ সম্পর্কে আমরা বেখবর।

সেই সময় তার অন্তরের চোখের দৃষ্টি গোপন রহস্যাদিকে অতিক্রম করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ ও বুদ্বিবৃত্তিক বস্তু সমূহ হতে উন্নতি লাভ করে। আর সাক্ষাত বা মিলনের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান এবং বন্ধুর সৌন্দর্য্যের সৌভাগ্য দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়। আর তার উপলব্ধির অবস্থা বুদ্ধি ও কল্পনা থেকে উত্তম এবং ধারণা ও খেয়াল সৃষ্টিজগত থেকে উঁচু মানের হয়ে যায়। আর ইহাই প্রকৃত প্রেমিক ও দৃঢ় প্রত্যয়ী খোদা তালাশকারীদের হজ্জ। সেই কারণে হযরত (দঃ) ইরশাদ করেন- "একটি হজ্বে মাবরুর (কবুলকৃত হজ্ব) পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম"। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) সত্য বলেছেন। আর ইহা যেটি হযরত (দঃ) ইরশাদ করেন, "হজ্বে মাবরুর (কবুলকৃত হজ্ব) এর বিনিময় জান্নাত ব্যতিত আর কিছু নেই"। অর্থাৎ যখন প্রেমাস্পদের মিলনে প্রেমাসক্ত হয়ে আশেক স্বীয় পরিবার-পরিজন, দেশ ও সম্পদের ভালবাসা ত্যাগ করে জান-প্রাণকে উৎসর্গ করেন, তখন প্রকৃত উদ্দিষ্ট ও প্রকৃত প্রেমাস্পদ

তাকে (আশেক) স্বীয় সন্তুষ্টির নির্জনতা ও সূমহান সাক্ষাত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করেন। আর বলেন, ইনি দগ্ধ হৃদয়ের প্রেমিক এবং ঘর-বাড়িহীন আশেক। যদি পারলৌকিক বেহেশতে দিদার (সাক্ষাত) এর অঙ্গিকার না হত, তাহলে কখনও তাদের (আশেক) অন্তরে বেহেশতের খেয়াল আসত না এবং তাঁদের মুখেও বেহেশতের নাম উচ্চারিত হত না। আর তাঁদের কোন ব্যক্তি স্বীয় আগ্রহে জান্নাতুল ফেরদৌসে পা রাখতেন না।

হে ভাইগণ! বেহেশতের দৃষ্টান্ত হল শামুক ঝিনুকের খোলের মত। কেননা প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির মনি-মাণিক্য উহার অভ্যন্তরে নিহিত। সুউচ্চ সাহসের অধিকারী ডুবুরী যিনি মহাসাগরে ডুব দেয়, রাজোচিত সদর দরজা ব্যতিত বের হন না। কোন সত্য অনুসন্ধানকারী বলেছেন-

চতুষ্পদী কবিতা

মিলনের শরবত দ্বারা স্বর্গের অনুভূতি লাভ করা যায়,
আশেকদের পথ পরিক্রমায় ইহাকে বেহেশত বলা হয়।
আমার নিজের কাছে বেহেশত ও দোযখ নাই,
কেননা, পাখির কাছে ফাঁদ ও ফাঁদে দেয়া খাদ্য একই।

আশেকদের প্রাণ পাখি মহান সত্তার বাতাসে অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌র নৈকট্যের আশায় উড়তে থাকে। উক্ত লালন-পালন অবস্থায় তাঁদের ফাঁদ ও ফাঁদে দেয়া খাদ্যের সাথে কি সম্বন্ধ রয়েছে? মূল কথা এই যে, যেখানে ভালবাসা ও প্রেমাবেগের আলোচনা চলমান, সেখানে বেহেশতের কথা ও দোযখের দুঃখ কষ্টের কখনও অবকাশ রাখে? গ্রন্থকার বলেন-

কবিতা

আসল বেহেশত হল খোদা মিলন,
আসল নরক হল বিরহ বিচ্ছেদ, জেনে রাখ।
প্রতিটি স্থানে তুমি থাক, তা হল- লামাকান (স্থান দ্বারা বিশেষিত নয়),
যেখানে তুমি থাক না সেটা নরক।
তোমার স্মরণে আমার প্রাণ পাখি লা-মকানে উড়ে যায়,
তোমার স্মরণ বিনে আমি হয়ে যায় গুপ্ত।
তোমার সাথে আমি যদি দোযখে থাকি,
জেনে রাখ, উহা অনন্ত বেহেশত।
বেহেশতে যদি আমার ঠিকানা হয়,
যদি তুমি সেখানে না থাক, তাহলে তা আমার জন্য নরক।

হযরত মুহাম্মদ বিন ফুযাইল (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, আমার বিস্ময় আসে যে, লোকেরা পৃথিবীতে বন্ধুর কা'বা গৃহকে অনুসন্ধান করে।

কেননা সেখানে বন্ধুকে পাওয়া ও না পাওয়ার সন্দেহ আছে। আর অন্তরে তাঁকে (বন্ধু) দর্শন করে না। কেননা ওখানে (অন্তরে) সাক্ষাতের সৌভাগ্য দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়া সুনিশ্চিত। যদিও ঐ পাথরের ঘরে যিয়ারত ফরজ, যেখানে সারা বছরে একবার বন্ধুর সুদৃষ্টি পতিত হয়। অতএব, ঐ অন্তরের যিয়ারত নিঃসন্দেহে পূর্ণ ফরজ; যেদিকে দৈনিক ৩৬০ বার মাহবুবে হাক্বিক্বি (প্রকৃত বন্ধু) স্বীয় অনুগ্রহে রহমতের সুদৃষ্টি ও তজল্লি (দ্যুতি) ঢেলে থাকেন। হযরত মাহবুবে সুবহানি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

আমার বান্দার পুরস্কার হল দৈনিক ৩৬০ বার তাঁর দিকে রহমতের সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা,
বান্দার মর্তবার প্রতি তাকাও তা কোথা থেকে কোথায় বিস্তৃত, অবলোকন কর।

আমরা জন্মগতভাবে সম্পদহীন ব্যক্তিদের জন্য কা'বা ঘরের যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়নি এবং বন্ধুর অন্তরের যিয়ারতও জুটেনি। মুসিবতের (বিপদ) মৃত্তিকা আমাদের মাথার উপর ঢালা উচিত। স্বীয় পশ্চাৎপদতা ও দূর্ভাগ্যের জন্য কান্নাকাটি করা আমাদের জন্য ওয়াজিব ও অনিবার্য। কলা-কৌশল ও তদবিরের মধ্যে হস্ত ধৌত করা আবশ্যক। কেউ সুন্দর কথা বলেছেন-

কবিতা

আমি প্রত্যুষে মনের আনন্দে দুঃখের রজনীর অনুসন্ধিৎসু হলাম,
খারাপ দিনকে কখনও তদবির ও অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করলাম।

হে ভাই! স্বীয় আমিত্বকে নিজের দাসত্ব থেকে অস্বীকারকারী হও। আর স্বীয় ঈমানকে (বিশ্বাস) বেল্ট মনে কর এবং স্বীয় ইবাদতকে মূর্তি পূজা মনে কর। নিজেকে যুগের নমরুদ ও কালের ফেরআউন কল্পনা কর। আর প্রত্যেক প্রকার মিথ্যা দাবি থেকে দূরে থাক। কেননা প্রভূত্বের সম্মানিত বিস্তৃতি এমন এক বিস্তৃতি যে কেউ উহার পার্শ্বে পৌঁছেন, সমস্ত মিথ্যা দাবী তার থেকে ছুটে গেল এবং সমস্ত পূঁজি তার থেকে হেরে গেল। তার সমস্ত পূণ্য কাজ পথভ্রষ্টতার রং ধারণ করল। আর তার সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী অবাধ্যতার সমকক্ষ হয়ে গেল। যদিও জগতের বাকপটু সেখানে বোবা হয়ে যায়। যদিও যুগের জ্ঞানী সেখানে মূর্খ হয়ে যায়।

যখন তাঁর (আল্লাহ) সুমহান অমুখাপেক্ষীতা ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি তুলে তাকাও, সমস্ত বিদ্যমান বস্তুসমূহকে অস্তিত্বহীন দেখতে পাবে। আর যখন তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও সম্মানের কথা চিন্তা কর, তখন সমস্ত অস্তিত্বহীন বস্তু সমূহকে বিদ্যমান দেখতে পাবে। যদি মর্জি হয় প্রতি মূহুর্তে লক্ষ লক্ষ মুহাম্মদ (দঃ) এঁর অনুরূপ নবী সৃষ্টি করেন। আর প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁদেরকে ক্বাবা

কাওসাইন (দুই ধনুকের ব্যবধান) এর মর্যাদা দান করবেন। তারপরও তাঁর জালালিয়তে এক অনু কম হবে না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হাজার হাজার লাখ লাখ ফেরআউনের অনুরূপ সৃষ্টি করেন, যাতে 'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু' এই দাবিটি মুখ থেকে বের হয়। তারপরও তাঁর জামালিয়ত (সৌন্দর্য) ও কামালিয়ত (পূর্ণতা) হতে এক অনুও কম হবে না। যদি তিনি চান, পৃথিবীর কাফির মুশরিকদেরকে দয়ার সমুদ্রে নিমজ্জিত করবেন। তারপরও তাঁর ক্রোধের বৈশিষ্ট্যে এক অনু পরিমাণও হ্রাস পাবে না। আর যদি তিনি চান সমস্ত পৃথিবীর নবী (আলাইহিমুস্সালাম) ও আউলিয়াদেরকে (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ক্রোধের শৃংখলে আবদ্ধ করে সদা সর্বদা বেদনাদায়ক কষ্টে রাখবেন। তারপরও তাঁর রহমতের বৈশিষ্ট্যে এক অণু পরিমাণও পার্থক্য হবে না। হে ভাই! যেখানে তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রসারিত করেন, সেখানে গোপন রহস্যাদি, ক্ষমতার আওতাধীন বস্তুসমূহ ও সৃষ্টি কূলের কি সমস্যা হতে পারে? কেউ স্বীয় ছেলেকে মক্তবে প্রেরণ করেছিলেন। যখন সন্ধ্যায় ছেলেটি ঘরে আসল জিজ্ঞেস করলেন, আজকে শিক্ষক তোমাকে কোন পাঠ পড়িয়েছেন? ছেলেটি উত্তর দিল, 'আলিফ' আর কিছুই না এবং 'সালাম'। [এখানে পবিত্র কথার সমাপ্তি]। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

এই আঁকা বাঁকা জগতে আমরা কী?
আমরা আলিফের মত যেটি পরিপূর্ণভাবে অঁকেজো।
যদি আলিফের মত খালি বা শূণ্য হয়ে যাও,
তবে এই পথে তুমি একক মানুষ হিসেবে পরিণত হবে।
আল্লাহ ব্যতিত অন্য সবকিছুকে ত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালাও
এবং তোমার হৃদয়কে এই নশ্বর জগত থেকে সরিয়ে দাও।

মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের অন্যতম মওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সূরা 'আলাম নাশরাহ' এর তাফসিরে লিখেন যে, অতএব, বিদ্বেষহীন মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বক্ষ একটি প্রশস্ত ময়দান। সেখানে একটি অত্যন্ত প্রশস্ত বিশাল ভবন অবস্থিত। আর সেখানে বারটি বৈঠক খানা রয়েছে। তন্মধ্যে কতগুলো দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং কতগুলো দ্বীনের (ধর্ম) সাথে সম্পর্ক রাখে। আর কতগুলো দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি থেকে উত্তম।

বারতম বৈঠকখানায় একজন চন্দ্র কপালতুল্য সুন্দর প্রেমাস্পদ রয়েছে। কা'বা ঘরের মত আল্লাহর সৌন্দর্য্যের তাজল্লি (দ্যুতি) তাঁর দেহকে ঘর বানিয়ে

দিয়েছেন এবং তুর পর্বতের মত অনাদি সৌন্দর্য্যের জ্যোতি তাঁর উপর ছড়িয়েছেন। খোদায়ী প্রেমময়তার শান-শওকত তাতে এতই সমুজ্জ্বল হয়েছে যে, স্বীয় ভালবাসার আকর্ষণ দ্বারা লোকদের অন্তর সমূহকে শিকারে পরিণত করেন। আর হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ পাগলবৎ চিরন্তন সৌন্দর্য্যের অধিকারী আশেকগণ উপকার লাভের আশায় তাঁর সমুজ্জল চেহারার পতঙ্গ হয়ে যায়। তাঁর মুহাব্বতের আকর্ষনে উপকার লাভের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে কপাল অবনত করে তাঁর সম্মানিত আস্তানায় সিজদা আদায় করে এবং তাঁর সৌন্দর্য্যের আগ্রহী হয়। এই মর্যাদা (মরতবা) ঐ সমস্ত মরতবা (স্তর) সমূহের মধ্যে গণ্য যে, কোন ব্যক্তি তা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু খোদার কাছে কবুলকৃত (গৃহিত) মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর অসিলায় প্রাপ্ত হন। আবার আল্লাহর আউলিয়াদের মধ্যে একটি দল রয়েছে যাঁরা যেকোনভাবে তাঁর প্রেমময়তার অংশ প্রাপ্ত হন। যার কারণে তাঁরা সৃষ্টিকূলের সিজদার যোগ্য এবং দুনিয়াবাসীদের অন্তরসমূহের প্রেমাস্পদে পরিণত হয়েছেন।যেমন হযরত মাহবুবে সোবহানী গাউছুল আজম আবু মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং সুলতানুল মাশায়েখ নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহি)। যদি কারো মনে উক্ত বারটি বৈঠকখানা (আসন) এর বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়, উচিত হবে যে, উক্ত উল্লেখিত কাজ সমূহে চিন্তা-ভাবনা করবেন যে, উক্ত উল্লেখিত কাজ সমূহের মূল উৎস কোথায় থেকে এসেছে? তখন সুনিশ্চিত ভাবে জেনে যাবে যে, এই সমস্ত বিষয়সমূহ মুহাম্মদী (দঃ) এঁর কামালিয়তের আলোকছটা। যেগুলো শাখা-প্রশাখা ও বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দলের কাছে পৌঁছেছে।

'মুনাক্কেবে মাহবুবীন' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত শাহ সোলাইমান মাহবুব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) আছর নামাজের পর তুসিনা মসজিদে জায়নামাজে উপবিষ্ট হন। আর আলেমগণ, ফকির (অলি) এবং আহলে সুফফার (বারান্দার অধিবাসী) সুধীগণও হুজুরের মজলিশে হাজির থাকতেন। আর আমি এই অধম বান্দা উক্ত মজলিশে বসা ছিলাম। যখন মাগরিবের সময় নিকটবর্তী হল, তখন হযরত মাহবুব নতুনভাবে অজু করার জন্য মজলিস থেকে প্রস্থানের জন্য উঠেন। মজলিশে উপস্থিত ব্যক্তিগণও হযরতের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি ওযু সমাপ্ত করে মসজিদে এসে জায়নামাজে উপবিষ্ট হন, তখন বসুর শহরের অধিবাসী একজন শিক্ষার্থী অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সাথে বলতে লাগল হযরত ইহা কিভাবে বৈধ যে, লোকেরা আপনার সম্মানার্থে মসজিদে দণ্ডায়মান হয়ে যাবে এবং সিজদা করবে? কেননা মসজিদে কারো সম্মান করা বৈধ নয় এবং তা'জিমি সিজদা (সম্মানসূচক

সিজদা) হারাম (নিষিদ্ধ)। বরং ইহা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তখন হযরত মাহবুব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) অত্যন্ত ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে বললেন, আমি কি কখনো কাউকে বলেছি যে, মসজিদে বা মসজিদ ব্যতিত অন্য জায়গায় আমাকে সম্মান কর এবং আমাকে সিজদা কর? সেই সময় খোরাসনের একজন আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত শিক্ষার্থীকে সম্বোধন করে বললেন, পীর, শিক্ষক, পিতা-মাতা, আলেম ও সৈয়দ বংশের লোকদের মসজিদের ভিতর সম্মান করা বৈধ। যেই হাদিসে মসজিদে সম্মান না করার ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে-এতদ্প্রসঙ্গে নবী (আঃ) ইরশাদ করেন, "আমার প্রভূর ঘরের মধ্যে আমাকে সম্মান করো না।"- সেই হাদিসটির অর্থ হল- মসজিদের ভিতর নামাজের মধ্যে আমার সম্মান করো না। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন রাসূল (দঃ) মসজিদে আগমন করতেন সাহাবাগন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নামাজরত থাকতেন। তখন তাঁরা নামাজ ছেড়ে দিয়ে হযরত (দঃ) এঁর সম্মান বজায় রাখতেন। ইহা হযরত (দঃ) নিষেধ করেন যে, নামাজরত অবস্থায় মসজিদে আমার সম্মান করো না। উহার পর উক্ত আলেম বলেন যে, তাজিমি সিজদা পীর, শিক্ষক, পয়গম্বর ও বাদশাহর জন্য বৈধ।

সিজদা দুই প্রকার। যথা ১. সিজদায়ে ইবাদত (ইবাদতের জন্য সিজদা) ২.সিজদায়ে তা'জিম (সম্মান সূচক সিজদা)- এই দুই প্রকারের সিজদা কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ্র বাণী- "অতঃপর সিজদা কর আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর ইবাদত কর।"(সূরা নজম)। আল্লাহ্র বাণী- 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু সিজদা করে।' (সূরা নাহাল)। উক্ত আয়াতগুলো সিজদায়ে ইবাদত সম্পর্কিত। কেননা উক্ত আয়াতগুলোতে উপাসক ও উপাস্যের শর্তারোপ করা হয়েছে। আর আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে সিজদা করার ব্যপারে যেই নিষেধাজ্ঞা হাদিসে এসেছে, তাহল উক্ত সিজদায়ে ইবাদত (ইবাদতের সিজদা) সম্পর্কিত। কেননা যেই ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনে করে সিজদা করবে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। কেননা সিজদায়ে ইবাদত আল্লাহ ব্যতিত অন্য করো জন্য বৈধ নয়। সিজদায়ে তা'জিমিও কুরআনের নস (আয়াত) দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'এবং যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর ইবলিশ ব্যতিত সবাই সিজদা করল" (সুরা বাকারা)। হযরত ইউসুফ (আঃ) এঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেন, 'তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল।' (সুরা ইউসুফ: ১০০)। এই সিজদা মোবাহ (অনুমোদনযোগ্য বা বৈধ)। যদি কেউ মাতা-পিতা, পীর, শিক্ষক ও

বাদশাহকে তা'জিমি সিজদা করল কাফির হবে না। তখন উক্ত শিক্ষার্থী এই কথা শুনে চুপ হয়ে গেল এবং আর কিছু বলল না।

'ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, 'আমার কাছে লোকেরা আসে এবং তাদের অবনত মুখাবয়ব জমিনে ঘর্ষণ করে এবং সিজদা করে । যেহেতু শায়খুল ইসলাম হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ও কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর এই ব্যাপারে নিষেধ ছিল না, আমিও নিষেধ করি না'। সেই সময় এক ব্যক্তি আরজ করল, যে লোক হুজুরের খেদমতে আসে এবং সিজদা করে ইহাতে সে উপকারিতা লাভ করে এবং তার নফ্স (প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা) পরাভূত হয়। মাখদুম (যাঁর সেবা করা হয় বা পীর-বুজুর্গ) এর বুজুর্গী খোদার দান। মাখদুমের বুজুর্গী মুরিদের খেদমতের উপর নির্ভরশীল নয়। অতঃপর শায়খুল মাশায়েখ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এই ব্যাপারে বর্ণনা করেন-পূর্বকালে একজন বুজুর্গের সন্তান সফর ও পরিভ্রমণ করতে করতে রোম ও সিরিয়া পরিদর্শন করে হযরত বাবা শায়খুল ইসলাম ফরিদ উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর আস্তানায় এসে পৌঁছেন এবং বসে পড়েন। ইত্যবসরে অহিদ উদ্দিন কুরাইশী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ওখানে এসে গেলেন এবং নিয়ম মাফিক তাঁর উপর অর্পিত খেদমত সম্পন্ন করেন এবং মস্তক যমীনে রাখেন। উক্ত ভ্রমণকারী ব্যক্তিটি উচ্চস্বরে বলতে লাগল, সিজদা করো না। সিজদা করা কোথাও আসেনি এবং এই ব্যাপারে ঝগড়া করতে লাগল। আমি চেয়েছিলাম তার (পর্যটক) কথার উত্তর দেওয়ার। কিন্তু যেহেতু সে বাড়াবাড়ি করতে লাগল, তাই তাকে এটা বললাম যে, শুন এবং বাড়াবাড়ি করো না। কেননা যেই ফরজ কাজের ফরজের হুকুম উঠে যায় উহার মুস্তাহাব বাকি থাকে। তাই, আশুরা ও আইয়ামে বীজের রোজা পূর্ব যুগের উম্মতের উপর ফরজ ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর যুগে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার কারণে আইয়ামে বীজের রোজা ও আশুরার রোজার ফরজের হুকুম রহিত হয়। কিন্তু ইহার মোস্তাহাব বিষয়টি অবশিষ্ট আছে। অনুরূপভাবে সিজদায়ে তাহিয়াও (তা'জিমি সিজদা) পূর্ব যুগের উম্মতদের উপর মোস্তাহাব ছিল। তাই, প্রজাগণ বাদশাহকে এবং উম্মতগণ পয়গাম্বরকে সিজদা করত। যখন রাসূল (দঃ) এঁর যুগে মোস্তাহাবের হুকুম রহিত হল। কিন্তু ইহার ইবাহত (অনুমোদন বা বৈধতা) এর হুকুম অবশিষ্ট থাকল। মোবাহ কাজের বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও নিষেধ কোথায় এসেছে? ভাল করে বল, ইহা কি নিছক অস্বীকার নয়? যখন ইহা বললাম, তখন সে চুপ হয়ে গেল এবং কিছু বলল না।

'ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ' গ্রন্থের অন্য স্থানে উল্লেখ আছে- এখানে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল যে, হযরত মাখদুম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মুরীদগন হযরত মখদুম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর খেদমতে আসে এবং মস্তক যমীনে রাখে। এই ব্যপারে হযরত খাজা যাকারাল্লাহু বিল খায়র (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- আমি চাচ্ছিলাম যে, এই ব্যপারে লোকদের নিষেধ করব। কিন্তু যেহেতু আমার শায়খের খেদমতেও এইরূপ করা হয় এবং তাঁরাও নিষেধ করেননি। সেই জন্য আমিও নিষেধ করছি না । এই ব্যপারে এক ব্যক্তি বলল, যেই বান্দারা পীরের খেদমতের সম্পর্ক তৈরি করল এবং স্বীয় ইচ্ছা সমূহকে পীরের ইচ্ছায় সোপর্দ করল। আর এই ইচ্ছাসমূহ ও বায়আত পীরের প্রতি ভালবাসা ও ইশক সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেখানে পীরের প্রতি ইশক ও ভালবাসা নিজের মধ্যে আসল, তখন মস্তক যমীনে রাখার মাধ্যমে খেদমতকে সহজ করে দেয়।

খাজা যাকারাল্লাহু বিল খায়র (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ইহার সমর্থনে বলেছেন- আমি হযরত শায়খুল ইসলাম ফরিদ উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হতে শুনেছি, একদা শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়র (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। একজন মুরিদ পদব্রজে সেখানে খেদমতে হাজির হলেন এবং হযরত শায়খ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর হাটু মোবারক চুম্বন করেন। শায়খ (ফরিদ উদ্দিন রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- আর নিচের দিকের মুরিদগণ শায়খের (শায়খ আবু সাঈদ রহমতুল্লাহে আলাইহি) পা মোবারকের উপর চুম্বন করেন। শায়খ বলেন, আর নিচের দিকে মুরিদগণ শায়খের (শায়খ আবু সাঈদ রহমতুল্লাহে আলাইহি) ঘোড়ার রেকাবে (প্যাডেল) চুম্বন করল। শায়খ বলেন, আর (সওয়ারীর) নিচের দিকের মুরিদগণ যমীনে চুম্বন করল। তখন শায়খ (আবু সাঈদ রহমতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, আমি যা তোমাদের বলেছিলাম, আর এখানে (সওয়ারীর) নিচে তোমাদের নফ্সের (আমিত্ব) দমন মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন যখনি তোমরা নিজেদের অবনত করছিলে, তখন তোমাদের মর্যাদা সুউচ্চ হচ্ছিল। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, শায়খের উপস্থিতিতে খেদমত আঞ্জাম দেওয়া নফ্সকে (কামনা-বাসনা) চরমভাবে বিসর্জন দেওয়া এবং স্বীয় দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ; যা কামালিয়ত (পূর্ণতা) অর্জনের কারণ। সেই কারণে ধর্মীয় আলেমগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সাথে শায়খের উপস্থিতিতে সিজদায়ে তাহিয়া (সম্মানসূচক সিজদা) করাকে বৈধ গণ্য করেছেন। কেননা উহা নফসকে (কামনা-বাসনা) দমন করে এবং মুরীদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। গঞ্জেরাজ গ্রন্থকার বলেন -

মসনবী

মুরিদ সবসময় অন্তরের মধ্যে মোর্শেদের চেহারার প্রতি নজর রাখবে,
মুমিনের মুখমণ্ডল মুমিনের জন্য আয়না, ইহাই পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য।
খাস (বিশেষ) ও আম (সাধারণ) তরিকতের শিক্ষার্থীরা এই মর্ম বিধানটি জেনে রাখ,
পীরকে সদা সর্বদা অন্তরের মধ্যে সিজদাহযোগ্য বানিয়ে রাখ।
যে মুরীদ অন্তরের মধ্যে পীরের চেহারাকে আয়না বানিয়ে রেখেছে,
তাতে সে খোদাকে দেখতে পায় এবং তখনই সিজদায় পতিত হয়।
শাহে মোরসালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
এঁর পূর্বেকার যুগে মানুষকে সিজদা করা মোস্তাহাব ছিল,
কোরআনে পাকে ইহার বর্ণনা দেখতে পাবে।
খোদায়ী ভাষায় দেখিতে পাবে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) কে সিজদা করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই নবী ছিলেন এবং অতীত যুগে অনুসরণযোগ্য মহাপুরুষ।
তৎপরবর্তী যুগের নবীগণও ইহা করেছেন,
নবীগণ হতে কখনো হারাম কাজ পাওয়া যাইতে পারে না।
পূর্বেকার যুগে যখন সিজদায়ে তাহিয়্যা মোস্তাহাব ছিল, অবশ্যই বর্তমান যুগে
ইহা মোবাহই,
এই প্রমাণাদি ছহীহ্ (বিশুদ্ধ) গ্রন্থ সমূহের মধ্যে দেখ।
একদা মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর খেদমতে জনৈক লোক এসে বলল, হে খোদার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আপনাকে সিজদা করতে স্বপ্নে দেখেছি। তখন রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য।
তৎপর উক্ত ব্যক্তি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সিজদা করল, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে সিজদা করতে নিষেধ করেননি।
অতীতের অধিকাংশ বুজুর্গানে দ্বীন উক্ত হাদিসের মর্মমতে
পীরকে সিজদা করা জায়েজ রেখেছেন।
সুনিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, মানুষ কবে মাটিকে সিজদা করেছে?
এইরূপ ইহা বুঝ যে, কা'বার দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা করা হয়।
পীরকে সিজদা করা সম্পর্কিত এই কথাটি আমি পুণরায় সুস্পষ্টভাবে বললাম।
ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম (আলাইহিস্সালাম) কে সিজদা করার কি রহস্য ছিল তা শুন।
তরিকত পন্থীদের নিকট সিজদার দুই অবস্থা,
যথা ১। তা'জিমী সিজদা (সম্মানসূচক সিজদা) ২। ইবাদতের সিজদা।

মানুষের জন্য তা'জিমী সিজদা এই কথা সত্য বলে জান এবং সৃষ্টিকর্তার জন্য
ইবাদতের সিজদা প্রযোজ্য। পীরকে সিজদাও এইরূপ।
জেনে রাখ, মুরীদের নিকট নিজ পীর হতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছু নাই,
তাই হাদিয়া স্বরূপ পীরের সামনে মাথা অবনত করে।
হে বৎস! সাবধান থেকো। ইহার বিস্তারীত বর্ণনা তুমি জেনেছ।
পীরের মুখমণ্ডল অন্তরের মধ্যে দেখতে থাক, তবে আল্লাহকে দেখতে পাবে।

গ্রন্থকার বলেন-

" হে উপাস্য! প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। এতদিন খোদায়ী করেছ; এখন পয়গাম্বরী চিফতে তোমার প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর"[১]।

মিশকাত শরীফে এসেছে- হযরত খোজাইমা বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা আবু খোজাইমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কপালে সিজদা করছেন। তাঁকে সিজদার কথাটি বর্ণনা করা হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার স্বপ্নটিকে বাস্তবায়ন কর। এই বলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কপালে সিজদা করলেন। শারহুস সুন্নাহ (মিশকাত শরীফ, হাদিস নং-৪৬২৪)। উক্ত হাদিসটির অনুবাদ 'মজাহেরে হক' গ্রন্থে আল্লামা কুতুব উদ্দিন সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ইহা লিখেন- ইবনে খোজাইমা বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। যাঁর নাম আবু খোজাইমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তিনি বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে দেখে তিনি অনুরূপ দেখলেন অর্থাৎ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কপালে সিজদা করলেন। অতঃপর এই স্বপ্ন তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনা সামনি পেশ করলেন। অতঃপর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিৎ হয়ে শুয়ে গেলেন যাতে আবু খোজাইমা কপালে সিজদা করতে পারেন

---

[১] এই সংযোজিত অংশটি নিম্নোক্ত পংক্তির বঙ্গানুবাদ- الهی عاشقان را رهبری کن- خدای کرده پیغمبری کن - সাজ্জাদানশীনে গাউছুল অজম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় এই শেয়ারটি 'আয়নায়ে বারি'র উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পবিত্র রওজা শরীফের ভিতরের দরজায় এই শেয়ারটি কাঁচের গ্লাসের উপর উক্ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে লিখা আছে। কিন্তু 'আয়নায়ে বারি' গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোর কোথাও পাওয়া যায়নি। হয়ত মুদ্রণের সময় ইহা বাদ পড়ে গেছে। যেহেতু নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে ইহা উক্ত গ্রন্থের শে'র। তাই ইহা উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে সংযোজন করা সমুচীন মনে করা হল (অনুবাদক)।

এবং বললেন, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর। অর্থাৎ তোমার স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ কর। অতঃপর তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কপালে সিজদা করলেন। এই হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপকারিতা : এই হাদিস উক্ত বিষয়ের উপর দলীল যে, স্বপ্নের বিষয় জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবায়ন করা মোস্তাহাব। যদি তা ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কিত হয়। যেমন স্বপ্নে দেখল যে রোজা রেখেছে অথবা নামাজ আদায় করেছে অথবা সদকা করেছে অথবা কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছে ইত্যাদি।

গ্রন্থকার বলেন, তাঁর (লেখক) কথা হল- যদি উহা (সিজদা) ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত হয় তাহলে এই দলীল প্রযোজ্য। কেননা আবু খোজাইমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সিজদা ইবাদত বন্দেগী সংশ্লিষ্ট ছিল। 'তোহফা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আদম (আ.) কে ফিরিশতাগণ দ্বারা সিজদা করানো হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তার পিতা-মাতা ও ভাইগণ কর্তৃক সিজদা করানো হয়। সিজদা ফরজ হওয়া ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিষয়টি খেয়াল করে দেখ যে, ইহা কোন নবীর যুগে ফরজ ছিল এবং এখন হারাম। লক্ষ্য কর, মাসের মধ্যে তিনটি রোজা হযরত আদম (আ.) এঁর সময়ে ফরজ ছিল। বর্তমানে ইহার ফরজ বিধান রহিত হয়ে মুস্তাহাব বিধান বাকি আছে। একইভাবে, সিজদার বিধানও আমাদের নবী (দ.) এঁর সময় কতেক অবস্থার প্রেক্ষিতে রহিত ছিল কিন্তু ইহার বৈধতা অবশিষ্ট আছে। এই ব্যপারে মওলানা নাসির উদ্দিন মাহমুদ চেরাগ দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন।

হযরত মওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় 'মজমুয়ায়ে ফতওয়া' গ্রন্থে লিখেন- এখন আমরা এই অনুসন্ধানে আছি যে, এই হযরতগণ সিজদা কেন জায়েজ রাখেন? উক্ত বুজুর্গদের নির্দেশক কর্মকাণ্ডসমূহ পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করার পর ইহা প্রমাণিত হল যে, তাঁরা সিজদাকে দুই প্রকার জানতেন। যথা-(১) সিজদায়ে ইবাদত (২) সিজদায়ে তাহিয়া। তাঁরা সিজদায়ে ইবাদতকে নিজেরা কুফরি ও কঠোরভাবে নিষেধ মনে করে এবং সিজদায়ে তাহিয়াকে জায়েজ (বৈধ) মানে। উভয় প্রকার সিজদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে উভয় সিজদার মধ্যে ভিন্নতা নেই। উভয় সিজদার মধ্যে তা'জিম (সম্মান) প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান দেখা যায়। ইহা হল এই যে, যদি কারো সাথে সাক্ষাতের প্রাক্কালে সুন্নতি সিজদায়ে তাহিয়ার ক্ষেত্রে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তখন ইহা সিজদায়ে তাহিয়া। যেমন আদম (আ.) এঁর জন্য ফিরিশতাদের সিজদা হল সিজদায়ে তাহিয়া। তাই, অধিকংশ মুফাস্সিরগণ এই কথার উপর রয়েছেন। আর কেউ কেউ বলেন- ইহা (আদম আলাইহিস্সালামকে ফেরেশতাদের সিজদা) আল্লাহ তায়ালার

উদ্দেশ্যে সিজদা ছিল এবং আদম (আ.) কে কেবলা বানানো হয়েছিল। যখন ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ.) এঁর মোকাবলায় বস্তুসমূহের নাম বলতে অপারগ হলেন, তখন তাঁরা (ফেরেশতাগণ) এই প্রকারের সিজদায়ে তাহিয়ার জন্য নির্দেশিত হলেন। ইহার উপর কিয়াস (অনুমান) করে অপরাপর শিক্ষার্থী (মুরিদ) ও নির্দেশিত ব্যক্তি তার আপন শিক্ষক ও মুরশিদকে উত্তম বিবেচনা করে ইহার (সিজদায়ে তাহিয়া) নির্দেশিত হবেন। 'মানাক্বেবে মাহবুবীন' গ্রন্থে লিখেন যে, তাফসিরে কাশশাফ গ্রন্থে আছে- আল্লাহ তায়ালার জন্য সিজদা হল ইবাদত সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা হল সম্মানসূচক।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, সিজদা দুইপ্রকার যথা ১.সিজদায়ে ইবাদত ২.সিজদায়ে তাহিয়া। সিজদায়ে তাহিয়া আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর জন্য ছিল এবং সিজদায়ে ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত- সিজদায়ে তাহিয়া 'সালাম' এর স্থলাভিষিক্ত। আর 'জামে ছগীর' এ বর্ণনায় এসেছে যে, মাশায়েখে কেরামদের (রঃ) উপস্থিতিতে চেহারা মাটিতে রাখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। 'ফতওয়ায়ে তাইসির' গ্রন্থে আছে যে, সিজদা দুই রকম। যথাঃ- ১.সিজদায়ে ইবাদত ২. সিজদায়ে তাহিয়া। সিজদায়ে ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত। আর সিজদায়ে তাহিয়া আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্য বৈধ। পাঁচটি স্থানের প্রত্যেক অবস্থায় সিজদার অনুমতি আছে। যথাঃ উম্মত নবীর জন্য, মুরিদ স্বীয় শায়খের জন্য, প্রজাগণ বাদশাহর জন্য, সন্তান পিতা-মাতার জন্য এবং দাস তার মলিকের জন্য। উক্ত পাঁচ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সিজদার ব্যপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

'ফতওয়ায়ে সিরাজি' গ্রন্থে আছে যে, যদি মানুষ কাউকে সিজদায়ে তাহিয়া করে তাহলে কাফির হবে না। আর 'কাফি' গ্রন্থে আছে, সদরুশ শহীদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করল এবং সম্মানের নিয়ত রাখল সে কাফির হবে না। 'কানযুল ইবাদ' গ্রন্থে আছে- যদি কেউ সম্মানার্থে বাদশাহর সহচরদের সামনে যমীনে চুম্বন করল সে কাফির হবে না। কেননা সে সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা করে দিয়েছিল। বরং ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে যারে' হতে হাদিস বর্ণিত আছে এবং তিনি (যারে') আব্দুল কায়েস এর সৈন্যদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বলেন-যখন আমরা মদীনায় আগমন করলাম, তখন পদব্রজে দৌঁড়াতে লাগলাম। আর আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাত ও পা মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম (আবু দাউদ)।

কতেক তাফসীর গ্রন্থে যেটি উল্লেখিত হয়েছে যে, ঐ সিজদা ইসলামের প্রবর্তনের কারণে রহিত হয়ে গেছে। তাই, তরিকতপন্থীগণ উহাকে অস্বীকার করে না। কেননা, এই লোকেরাও (তরিকতপন্থী) বলেন যে, ঐ সিজদা রহিত হয়ে গেছে। ইহার অর্থ হল-এ প্রকারের সিজদার (সিজদায়ে তাহিয়া) ফরজ ও মোস্তাহাব বিধান রহিত হয়ে গেছে। আর এই রহিত হওয়া দ্বারা আবশ্যক হয় না যে, ইহার ইবাহতও (বৈধতা) রহিত হয়ে যাবে। আর তাফসীরকারকদের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা, তাঁরা যেখানে উক্ত সিজদাকে রহিত হয়ে গেছে লিখেছেন, তাঁরা ইসলামের কারণে রহিত হয়ে গেছে লিখেছেন। যেমন তাফসিরে মাদারিক ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের শরীয়তের বিধানের মধ্যে থেকে যা কিছু ইসলামের কারণে রহিত হয়ে গেছে এবং উহার ব্যপারে অন্য কোন হুকুম (বিধান) আমাদের শরীয়তে নাযিল হয়নি। আর আবশ্যক নয় যে, উহা (পূর্ববর্তী যুগের শরীয়তের বিধান) মৌলিকভাবে হারাম হয়ে যাবে। বরং কায়দা (নিয়ম) হল, বস্তুর ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হল ইবাহত (সিদ্ধ) হওয়া। অর্থাৎ বস্তু মৌলিক সিদ্ধতার উপর অবশিষ্ট থাকে। কেননা ইবাহতে আসলিয়া (মৌলিক বৈধতা) শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে একটি বিবর্ধক বিষয়। শরীয়ত সম্মত হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেলে ইবাহত (বৈধতা) রহিত হয় না। সেই কারণে ধর্মীয় বুজুর্গগণ, মুফাসিসর ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মুহাদ্দিসগণ ও শক্তিশালী শরীয়তের ফিকহবিদগণ আল্লাহ ব্যতীত সিজদায়ে তাহিয়া অপরাপর পাঁচ ব্যক্তিদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইহাও জানা উচিত যে, যতগুলো মানসুখ আয়াত (রহিত আয়াত) রয়েছে সবগুলোকে 'তাফসীরে আহমদী'র গ্রন্থকার সবিস্তারে এইগুলোর তাফসির উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আয়াতে সিজদাকে (সিজদার আয়াত) আয়াতে মানসুখ (রহিত আয়াত) এর মধ্যে গণ্য করেননি। অথচ, 'তাফসিরে আহমদীর' লেখক 'নুরুল আনোয়ার' গ্রন্থে লিখেন- এই সমস্ত যা কিছু আমি উল্লেখ করেছি কুরআনে আমলকারীদের জন্য জানা ফরজ। যাতে নাসেখ (রহিতকারী আয়াত) ও মানসুখ (রহিত আয়াত) এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর আমি এইগুলোকে (নাসেখ ও মানসুখ আয়াত) তাফসিরে আহমদীতে পুরাপুরি বর্ণনা করেছি। এর চেয়ে বেশি হানাফি মাজহাবের অন্য কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়নি। এর দ্বারা জানা গেল যে, ঐ আয়াত (সিজদায়ে তাহিয়ার আয়াত) হানাফি মাজহাবে রহিত হয়নি। আর ফিকহবিদদের কতেক বর্ণনায় যা এসেছে- উল্লেখিত আয়াতসমূহ (সিজদার তাহিয়ার আয়াত) হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর ইহা (এই ধরণের বক্তব্য) মুহাক্কিক (সত্য অনুসন্ধানী) আলেমদের মতামতের বিপরীত। কেননা

সিজদায়ে তাহিয়ার আয়াত হাদিসের প্রকারভেদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হাদিসের মুহাক্কিকদের [হাদিস বিশেষজ্ঞ] নিকট তা মানসুখ [রহিত] হয়নি। যেমন 'তাফসিরে আহমদী'তে লিখেছেন- মুহাক্কিক আলেমগণ (বিশেষজ্ঞ আলেমগণ) ইহার উপর যে, ইহা (সিজদায়ে তাহিয়া) মানসুখ (রহিত) হয়নি। কেননা মানসুখকরণ (রহিত) বিষয়টি শরীয়তের বিধানাবলীর উপর হয়ে থাকে। কিন্তু কোন সংবাদ বা ঘটনার উপর হয় না।

'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে আছে-উসুলের কিতাব সমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্বেকার উম্মতদের শরীয়ত আমাদের জন্য হুজ্জাত (দলীল)। যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (দঃ) অস্বীকার ব্যতীত তা বর্ণনা করেন এবং উহার রহিতকারী দলীলও প্রকাশ্যে থাকে না। অতএব, অবতারিত আয়াতের উপকারিতা বজায় রাখা এবং তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা প্রামাণ্য বিধান হিসেবে সাব্যস্ত। আর উক্ত বিধানের অন্য প্রমাণ অবশিষ্ট থাকার উপর বিষয়টি নির্ভরশীল করা কোন আবশ্যক নয়। 'নুরুল আনোয়ার' গ্রন্থের ইহা একটি বড় নিয়ম ও বড় মৌলিক বিষয়। ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর এই বিষয়ে অনেক ফিকহী বিধান প্রণীত হয়েছে। কেননা, যখন আল্লাহ তায়ালা উহাকে (সিজদায়ে তাহিয়া) আমাদের কিতাবে (কুরআন) বর্ণনা করেছেন, তখন ইহা আমাদের ধর্মের একটি অংশ হয়ে গেছে।

হযরত শায়খ আব্দুল করিম গুজরাটি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় তাফসিরে 'কালালী'তে; যেটি তিনি তাসাউফের রীতি পদ্ধতিতে লিখেছেন। তিনি উক্ত তাফসিরে সুরা ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর তাফসিরে লিখেন, যার সারমর্ম হল এই- উসুলের কায়দা (নিয়ম) অনুযায়ী আমাদের পূর্ববর্তী নবীদের (আলাইহিস্সালাম) শরীয়ত আমাদের জন্য দলীল যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধানের কোন নাসেখ (রহিতকারী বিধান) প্রকাশিত না হয়। আর সিজদায়ে তাহিয়া হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্সালাম) এঁর শরীয়তে কিতাব (কুরআন) এর আয়াত দ্বারা জায়েজ ছিল। আল্লাহ্র বাণী- "তারা সবাই তার সামনে সেজদাবনত হল।" (সূরা ইউসুফঃ ১০০)। তাই, উল্লেখিত কায়দার (নিয়মনীতি) ভিত্তিতে আমাদের শরীয়তেও তা জায়েজ হবে। আর নাসেখ (রহিতকারী বিধান) আমাদের শরীয়তেও জায়েজ হবে। আর আমাদের শরীয়তে নাসেখ (রহিতকারী আয়াত বা হাদিস) 'খবরে ওয়াহেদ'[১] ব্যতিত নেই। উহা হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বাণী- 'যদি আমি আদেশ করতাম কাউকে অন্য কাউকে সিজদা করতে। তাহালে আমি আদেশ

[১] উসূলে হাদীসে এক, দুই বা তিনজন বর্ণনাকারী (রাবী) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বলা হয়। খবরে ওয়াহেদ হাদিস গ্রহণযোগ্য (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

করতাম স্ত্রীগণ তার স্বামীকে সিজদা করবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির উচিত নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা'। অথচ কোরআনের আয়াতকে নসখকারী (রহিতকারী) হাদিস 'খবরে মুতাওয়াতির'[১] হওয়া আবশ্যক 'খবরে ওয়াহেদ' নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- 'আমার বাণী আল্লাহ্‌র বাণীকে রহিত করে না'। তাসত্ত্বেও উক্ত 'খবরে ওয়াহেদ'এ কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কারণে নিষধ করেছেন যে, মানুষ কুফরী যুগের কাছাকাছি এবং গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত) ইবাদতে আসক্ত ও অভ্যস্ত। সেই সময় উক্ত সিজদায়ে তাহিয়ার সাথে সিজদায়ে ইবাদতের সাদৃশ্যতার সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুযাফ্‌ফাত [আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র] ও আংটির ব্যপারে নিষেধ করেছিলেন।

'লুমআ'ত' গ্রন্থে লিখা আছে যে, 'তাহলে আমি আদেশ করতাম স্ত্রীগণ তাদের স্বামীকে সিজদা করবে'। হাদিসের উক্ত অংশটি ব্যাপক অর্থবোধক। ইহা দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য আবশ্যক হওয়া বুঝায়। ইহা দ্বারা সিজদায়ে তাহিয়া নিষেধ হওয়াকে বুঝায় না। যাতে হাদিসটি আয়াতের (সিজদায়ে তাহিয়ার) নাসেখ (রহিতকারী) হিসেবে মনে করা না হয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বাণী, ' কিন্তু কোন ব্যক্তির উচিত নয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা'। এই হাদিস দ্বারা নিষেধ কোনভাবেই সাব্যস্ত হয় না।

'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' গ্রন্থে আছে- যদি বাদশাহ সিজদায়ে তাহিয়ার নির্দেশ দেন, সিজদায়ে ইবাদত নয়। তাহলে সিজদা করা উত্তম। এইরূপ 'ফতওয়ায়ে ক্বাযিখান'-এ রয়েছে। উহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, সিজদায়ে তাহিয়া জায়েজ। আর যিনি হারাম বলেছেন, তিনি উক্ত সংশয়পূর্ণ ও অসস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহন করেছেন। যেমন 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে-'তিনি (গ্রন্থকার) বলেছেন- উহা (সিজদায়ে তাহিয়া) প্রতিমা পূজার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কিন্ত 'ক্বাযীখান' এর ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, অস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হাদিস হারাম (নিষেধ) এর উপকারিতা প্রদানের ব্যপারে আমলযোগ্য

---

[১] পরিভাষায় মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে যার রাবীর সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁরা মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন কিংবা ঘটনা সম্পর্কে সকলে মিথ্যা কথা বলছেন- বিবেক তা অসম্ভব মনে করে: আর এই সংখ্যাধিক্য সনদের সকল স্তরে সমান থাকে এবং সাহাবী থেকে হাদীসটি رَأَيْتُ (আমি দেখলাম) বা سمعتُ (আমি শুনলাম) শব্দে বর্ণিত হয়, যা শোনার সাথে সাথে ইলমে ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জ্ঞান) এর ফায়দা দেয় (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

নয়। কেননা, উছুলের কিতাব সমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সমস্ত বিষয়ের হুকুম আযীমত (দৃঢ় সংকল্প) এর পর্যায়ভুক্ত, উহার কর্ম সম্পাদন ত্যাগ করা উত্তম হয় না। যদিও তা বাদশাহী নির্দেশ দ্বারা হয়। অতএব, যখন সিজদায়ে তাহিয়া বাদশাহী হুকুম থেকে উত্তম গণ্য হল। তাহলে জানা গেল যে, বিরুদ্ধবাদীদের কথা অনুযায়ী সিজদায়ে তাহিয়ার নিষেধ হওয়ার হুকুম হুকুমে আসলীর (মূল হুকুম) পর্যায়ভুক্ত নয়। ইহা (হুকুমে আসলী) আযীমতের (দৃঢ় সংকল্প) পর্যায়ভুক্ত। বরং উহার হুরমত (নিষেধ হওয়া) কখনও রহিত হয়ে হালাল হয়ে যায়। কেননা কায়েদা (নিয়ম) হল- যে হুরমতে আসলিয়া (মৌলিকভাবে হারাম) আযীমতের পর্যায়ভুক্ত নয়, তা রহিত হয়ে যায়। অতএব, যখন ইহা প্রমাণিত হল -এখন জেনে রাখ যে, অস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হাদিসটি এই ক্ষেত্রে (সিজদায়ে তাহিয়া) আমলযোগ্য নয় । অন্যথায় বিরুদ্ধবাদীদের কথা অনুযায়ী সিজদায়ে তাহিয়া নিষেধ হওয়া আযীমতের পর্যায়ভুক্ত হত। তখন উহা ত্যাগ করা সিজদায়ে ইবাদতের মত উত্তম হত না। তুমি কি দেখনা যে, তাশাব্বুহ (সংশয় পূর্ণ বিষয়) প্রত্যেক ব্যপারে হুরমতের (নিষেধ) উপকারিতা দেয় না। বরং উহাতে শর্ত যে উক্ত বিষয়টি মৌলিকভাবে মন্দ ও নিন্দিত হবে। ইহাতে তাশাব্বুহ (সংশয়-সন্দেহ বা হারাম ও হালাল হওয়ার সম্ভাবনা) উদ্দেশ্য হবে। তাসত্ত্বেও, নিছক সংশয় ও সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেখানে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি নেই।

যদি উহাতে উক্ত শর্ত সমূহ হতে কোন শর্তও পাওয়া না যায় তাশাব্বুহ সাব্যস্ত হবে না। যেমন 'রদ্দে মুখতার' গ্রন্থে আছে। ইহা 'বাহরুর রায়েখ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইহা স্পষ্ট যে, সিজদায়ে তাহিয়া মৌলিকতার বিচারে কোনভাবে খারাপ ও নিন্দনীয় নয়। কেননা উহার মোস্তাহাব কুরআনের নস (আয়াত) দ্বারা সাব্যস্ত। বরং নিয়ম অনুযায়ী 'আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের শরীয়ত আমাদের জন্য হুজ্জত (দলিল)'। তাই ইহার শরীয়ত সম্মত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর যে বস্তু শরীয়ত সম্মত উহা নিন্দনীয় হওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাসত্ত্বেও উহার তাশাব্বুহ (সংশয়পূর্ণ বা অস্পষ্ট অর্থ) উদ্দেশ্য নয়। বরং উহা দ্বারা বান্দার কল্যাণ উদ্দেশ্য। অতএব, সংশয়পূর্ণ অর্থের ক্ষেত্রে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। ইহা দ্বারা ঐ ব্যক্তির উক্তিও দুর্বল হিসেবে পরিগণিত হওয়া জানা গেল, যে বলে, সিজদারে তাহিয়া হারাম হওয়ার কারণ হল- ইহা কিতাব (কুরআন) দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়েছে। তুমি কি দেখ না যে, 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের লেখক ষষ্ঠ স্তরের ফকিহ ছিলেন? তিনি এই পর্বে তাশাব্বুহ হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহন করেছেন। যদি ইহা (সিজদায়ে তাহিয়া) হারাম হওয়ার কারণ কুরআনের রহিতকরণ হত, তাহলে তিনি ইহা দ্বারা

দলীল গ্রহণ করতেন। এখন হাদিসে তাশাব্বুহ হারাম হওয়ার ইল্লত (কারণ) নয় এবং নসখে কিতাব (কুরআনের রহিত করণ)ও ইল্লত নয়। অতএব, জানা গেল যে সিজদায়ে তাহিয়া জায়েজ ও মোবাহ।

'মাদারিজুন নবুয়ত' গ্রন্থে আছে যে, এক প্রকার সিজদায়ে তাহিয়া রয়েছে, ফকীহদের বিভিন্ন বর্ণনায় উহার ব্যপরে রুখসত (ছাড়) এসেছে। কতেকের নিকট ইহা নিষিদ্ধ। কেননা, ইহা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিজেকে অবনত করা বুঝায় । কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের পরে স্পষ্ট হয় যে, তাঁদের নিষেধ যদিও প্রকাশ্যে দৃষ্টিতে সাধারণ হিসেবে ধরা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শর্তযুক্ত। কেননা, সাধারণ অবনত হওয়া গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ) এর জন্য নিষেধ নয়। বরং গায়রুল্লাহকে পার্থিব উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ করা হারাম হয়ে থাকে। এই ব্যপারে মূল দলিল হল নবী (আঃ) এর বাণী- 'যে ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তির ধন সম্পদের কারণে তার প্রতি বিনয় প্রকাশ করল, তার দুই তৃতীয়াংশ ধর্ম কর্ম চলে গেল'। সেই কারেণে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী'তে বিরুদ্ধবাদীদের উক্ত কথার বর্ণনার সাথে هؤلاء لجبابرة (দেবতাগণ) শব্দটি শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু মনসুর মাতুরদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- কেউ যমীনে চুম্বন করল অথবা পৃষ্ঠ ঝুঁকাল বা মাথাকে যমীনে ঘর্ষণ করল, সে কাফের হবে না। কেননা সে সম্মানের উদ্দেশ্যে করেছে। ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের মাশায়েখদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন- যদি ঐ সমস্ত দেবতাদের [জাবাবেরা] জন্য সিজদা করল তাহলে কবিরা গুণাহ হবে। আর গোপন থাকে না যে, জাবাবেরাদের (দেবতা) সিজদা পার্থিব উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। অতএব, সাধারণভাবে মতানৈক্য নিষেধের ক্ষেত্রে কিন্তু মূল ইল্লত (কারণ) এর ক্ষেত্রে নয়। আর এই মতেভেদ দেবতাকে সিজদা করার ক্ষেত্রে, মাশায়েখদের সিজদা করার ক্ষেত্রে নয়।

অতএব, পার্থিব উদ্দেশ্যে সবার নিকট হারাম। আর পরকালের উদ্দেশ্যে ও ধর্মের কামালিয়ত (পূর্ণতা) হাসিলের উদ্দেশ্যে ইহা (সিজাদায়ে তাহিয়া) সবার নিকট বৈধ। তাই 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে আছে- আলেম (জ্ঞানী) ও ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হস্ত চুম্বন বৈধ নয়। 'মুহিত' গ্রন্থে আছে- ইসলামের সম্মান ও ইজ্জতের জন্য বৈধ এবং পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তা মাকরুহ। যদি কেউ কোন আলেম বা যাহেদ (খোদাভীরু) এর পদচুম্বন করতে চাইল এবং তিনি তা কবুল করলেন। ইমাম নববী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- কদমবুচি (পদচুম্বন) যদি খোদাভীরুতা, সততা, জ্ঞান ও সম্মানের কারণে হয় মাকরুহ নয়। বরং তা মোস্তাহাব। যদি পার্থিব ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে একেবারে

মাকরুহ। হযরত মওলানা শাহ মঈন উদ্দিন ওয়ায়েজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর তাফসীর 'নুক্বরা' গ্রন্থে হযরত ইমাম হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর জন্য তাঁর ভাইয়েরা প্রকৃত সিজদা সম্পাদন করেন এবং মাথা যমীনে রাখেন। কিন্তু তা সম্মানার্থে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। কেননা ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট।

'তাফসিরে আবু সাউদ' (রহমতুল্লাহে আলাইহি) গ্রন্থে আছে- সিজদার অভিধানিক অর্থ হল বিনয় ও বশ্যতা স্বীকার করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের উদ্দেশ্যে কপাল মাটিতে রাখাকে সিজদা বলা হয়। বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যাতে আদম (আঃ)কে সম্মানার্থে সিজদা করেন। আর তাঁকে স্বীকার ও সমর্থন করেন। আর তাঁর শিক্ষার হক পূর্ণ করেন। আর ঐ বেআদবী ও স্পর্ধা যা কিছু তাঁদের (ফেরেশতা) থেকে হযরত আদম (আঃ) এঁর ব্যপারে সংঘটিত হয়েছিল ইহার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর বলা হয় যে, সিজদা (আদম আল্লাইহিস্সালামকে সিজদা) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছিল এবং আদম (আঃ) তাঁদের সিজদার কেবলা ছিল। আর প্রথম কথাটি অধিকতর সুস্পষ্ট। 'তাফসিরে মুয়ালিমিত্তানযিল' এ আছে- আল্লাহ্র বাণী, 'তোমরা সিজদা কর'। এখানে দুটি মত রয়েছে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হল এই যে, সিজদা প্রকৃতপক্ষে আদম (আঃ) এঁর জন্যই ছিল এবং উক্ত সিজদায় আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের কারণে আল্লাহ্র আনুগত্যের মর্মার্থও পাওয়া গিয়েছে। আর উহা সিজদায়ে তাহিয়া ছিল, সিজদায়ে ইবাদত ছিল না । 'তাফসিরে কবিরে' আছে -তৃতীয় মত এই যে, সিজদার মূল অর্থ অনুগত হওয়া এবং বিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তৃতীয় মত দূর্বল। কেননা নিঃসন্দেহে সিজদা শরীয়তের পরিভাষায় 'যমীনের উপর কপাল রাখা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, আবশ্যক যে, মূল শব্দগত অর্থেও এইরুপ হবে। কেননা আসল (মূল) পরিবর্তন হয় না। অতএব, উহা থেকে সুস্পষ্ট হল যে, ফেরেশতাদের সিজদা আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর জন্য এবং ভাইদের সিজদা ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর জন্য সম্মানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত সিজদা ছিল। ইহা আনুগত্য ও নিছক বিনয় ছিল না। আর ইহা থেকে ইহাও জানা গেল যে, উল্লেখিত সিজদা (সিজদায়ে তাহিয়া) রহিত হওয়া নিম্নেক্ত হাদিস অনুযায়ী- 'যদি আমি আদেশ করতাম কাউকে সিজদা করার জন্য' দূর্বল সাব্যস্ত হল। কেননা ফেরেশতাদের সিজদার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতামত এবং অনেক সম্ভাব্য বিষয় রয়েছে। উহা নসখ (রহিতকরণ)কে নিষধ করে এবং ইহার [নসখ] বিপরীত। কেননা যিনি বলেছেন যে, ঐ সিজদা বিনয় ও আনুগত্যের জন্য ছিল। তার এই মত অনুয়ায়ী ইহা নসখের কোন পদ্বতিতেই পড়ে না।

আর যিনি বলেছেন যে, সিজদা আল্লাহ তায়ালার জন্য ছিল এবং আদম (আলাইহিস্সালাম) কেবলার মত ছিলেন। উক্ত অবস্থায় নসখের কোন পদ্ধতিও প্রযোজ্য হয় না। কেননা যখন সিজদা আল্লাহ তায়ালার জন্য তখন এক্ষেত্রে নসখের (রহিতকরণ) কি অর্থ দাঁড়ায়? অথচ গায়রুল্লাহকে কেবলা বানিয়ে আল্লাহকে সিজদা করা নিঃসন্দেহে সিদ্ধ।

যেমন কা'বা ঘরের ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান। আর যিনি বলেছেন- প্রকৃতপক্ষে সিজদাটি আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর সম্মানার্থে ছিল। এই অবস্থায়ও নসখ (রহিতকরণ) সুনিশ্চিত নয়। কেননা হাদিসের বর্ণনা প্রসঙ্গটি স্বামীর আনুগত্য বুঝায়। যেহেতু 'লুমআ'ত' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্ট এবং ইহা ঐ কথার উপর দলীল যে, উক্ত হাদিসে নিষিদ্ধ সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য হল সিজদায়ে ইবাদত। যদিও হাদিসটির অর্থ আম বা ব্যাপক অর্থবোধকও ধরা হয়। উক্ত অবস্থায় উদ্দিষ্ট অর্থ বর্ণনা করা আবশ্যক। কেননা মুশতারিক (একাধিক অর্থপূর্ণ শব্দ) এর যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় না, ততক্ষণ উহা প্রমাণ সাব্যস্ত করার জন্য যোগ্য হয় না। আর বাহ্যিক শরীয়তের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে যে, আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) যাহের পন্থীদের [বাহ্যিক শরীয়তে আমলকারী] অনুসরণ করেন না। কিন্তু যেখানে সত্য উদ্ভাসিত সেই অবস্থা ব্যতিত। সিজদায়ে তাহিয়া যদিও ফকীহদের নিকট মতভেদপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যখন উহার বৈধতা মনোনীত আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) দিয়েছেন। তাহলে আবশ্যক যে, এই মাসয়ালাটি আমলযোগ্য ও বৈধ হওয়া উচিত। কেননা আউলিয়া কেরামগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) কখনো নিষিদ্ধ বিষয় এবং পাপকার্যের দিকে পা বাড়ান না। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'জেনে রাখ, আল্লাহ্র আউলিয়াগণের কোন ভয় নাই এবং তাঁদের পেরেশান হওয়ার কারণ নাই।' (সূরা ইউনুসঃ ৬২)।

হে বন্ধু! এই মাসয়ালাটি কুরআন, হাদিস, ফিকহ, উসুল শাস্ত্র, ধর্মীয় বুজুর্গদের আমল ও মতামত হতে সাব্যস্ত। ইহার উপর যদি কোন গোঁয়ার ও মুর্খ তর্ক করে, তাহলে ইহার উত্তর হল নীরবতা। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম' [সূরা ফুরকান-৬৩]।

কবিতা

যে ব্যক্তি কোরআন-হাদিসের খবর রাখে না,
তার উত্তর হল কোন উত্তরই না দেওয়া।

সালাম ঐ ব্যক্তির উপর যিনি তাঁর হেদায়তের অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয় ফরতু (রশ্মি) : মুরিদের তিনটি অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে

'জাওয়াহেরুল মুলক' গ্রন্থে আছে যে, হে প্রিয় বন্ধু! মুরিদের তিনটি অবস্থা রয়েছে। যথাঃ ইবতেদা (প্রারম্ভ স্তর), তাওয়াস্সুত (মধ্যম স্তর) ও ইনতেহা (শেষ স্তর)। মুরিদে মুবতাদী (প্রাথমিক স্তর) উহাকে বলে, যার থেকে বাহ্যিক সম্পর্ক ছুটে গেছে এবং সমস্ত সৃষ্টি জীব, দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের থেকে যিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আর তার বাসনা কেবল তিনি (পীর) ব্যতীত সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তার [মুরিদ] প্রিয় মুহূর্ত সমূহ আল্লাহ্র স্মরণে সিক্ত। আর স্বীয় মুরাদ (ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সমূহ) পীরের তাছার্রুফের (প্রভাব) বলয়ে সোপর্দ করেছে। যখন মুরিদের ইচ্ছা সমূহ পীরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যে ফানা (বিনাশ) হয়, তখন মুরীদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সমূহ ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। এইরূপ ব্যক্তে ও অব্যক্তে পীরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়া মুরীদের কোন প্রকার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থাকবে না। এমনকি, যেই মুরিদের মধ্যে পীরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যতীত এক অনু পরিমাণও বাসনা ও উদ্দেশ্য আবশিষ্ট থাকবে, তখন সে স্বীয় উদ্দেশ্যের মুরীদ গণ্য হবে এবং পীরের উদ্দেশ্যের মুরিদ হবে না। কেননা মুরীদের প্রকৃত ইচ্ছা হল নিজ ইচ্ছাকে ত্যাগ করা। নিয়ম ও অভ্যাস ত্যাগ করা নয়।

মসনবী

তবে নিয়ম ও অভ্যাস তোমার পথ প্রদর্শক,
হাকিকি মুরীদ থেকে তুমি দূরে।
যদি তুমি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাও,
হে বুদ্ধিমান যুবক! পীরে কামেল অনুসন্ধান কর।
নিজেকে পথ প্রদর্শক পীরের রেকাব (পাদানী) দ্বারা বাঁধ,
যাতে এই বন্ধন দ্বারা তোমাকে রক্ষা করতে পার।
যখন তুমি পীরে কামেলের কাছে পবিত্রতা অর্জন করেছ,
তাই আবার অপবিত্র হবে না।

মুরীদে মুতাওয়াস্সাত (মধ্যম স্তরের মুরিদ) এর কাজ কারবার হল খোদাভীরু ও ইবাদতকারী মুরিদের বিপরীত। কেননা মুরীদ হল- খোদা তালাশকারীর নাম ও কাজকে বুঝায়। যেরূপ বাহ্যিক পবিত্রতা রয়েছে, অনুরূপ আভ্যন্তরীন পবিত্রতাও রয়েছে। কোরআন তেলোয়াত, রোজা ও নামাজ দ্বারা তার [মুরিদ] কোন কাজ নেই। হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতাংশ

হে সুশোভিত প্রদীপ! তবে তোমার চেহারা আমি দর্শন করলাম,
আমি আর কোন কাজ করি না, রোজা রাখিনা ও নামাজ পড়ি না।
কেননা তুমি বিনে আমার নামাজ কেবল সবটাই গুনাহ,
যখন তোমার সঙ্গে আমার পাপসমূহ সবটাই নামাজ।

কেননা শরীয়তের বিধানাবলী পালন ও কুরআন তেলোয়াত করা ভাল কাজ। আর খোদা তালাশকারীর ব্যপার ভিন্ন। ইহাও বাহ্যিক পবিত্রতা, বাতেনী পরিশুদ্ধতা, তাজকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও তাজলিয়ায়ে নফ্স (নফ্সের উজ্জ্বল্য) হিসেবে গণ্য; যা মন্দ গুণাবলী থেকে মুক্ত করে। যার দিকে এই চতুষ্পদী কবিতা ইঙ্গিতবহ।

চতুষ্পদী কবিতা

যদি অন্তরকে আয়নার মত করতে চাও,
তাহলে নিজের বক্ষ থেকে দশটি বস্তু দূর কর।
সেগুলো হল- লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, মিথ্যাচার, পরনিন্দা,
কৃপণতা, হিংসা, প্রদর্শনেচ্ছা, অহংকার ও বিদ্বেষ।

অতএব, তাজলিয়ায়ে নফ্স (নফ্সের উজ্জ্বল্য) হল প্রশংসীত গুণাবলী অর্জন করা ও সুলুকের স্তর সমূহ ও উহার কার্যাবলীকে বুঝায়; যার দিকে এই চতুষ্পদী কবিতা ইঙ্গিত করে।

চতুষ্পদী কবিতা

যদি স্থায়ী নৈকট্যপূর্ণ স্তর পেতে চাও,
তাহলে নয়টি বিষয় নিজেকে শিক্ষা দাও।
সেগুলো হল- ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, অল্পে তুষ্টি, জ্ঞান, ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস),
নিজের ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছায় সমর্পন, খোদা নির্ভরতা, সন্তুষ্টি ও
আত্মসমর্পণ।

'যা তোমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে, তাহল তোমার পার্থিব মেলামেশা ও তোমার সীমালংঘন'- এই কথার তাৎপর্য অনুযায়ী তার (মুরিদ) উপর পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ ও কঠোর সংযম আবশ্যকীয় ফরজ। রোজা ও নামাজ এর উপর গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক নয়।

তাফসিরে শায়খে আকবর মুহিউদ্দিন আল আরবীতে (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী জ্ঞান অনুসন্ধানে যখন তোমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে পরিভ্রমন কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে

তোমাদের কোন গোনাহ নেই অর্থাৎ তোমরা শারীরিক আমলসমূহ, শোকর (কৃতজ্ঞতা) ও হুজুর (আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিতি) ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হকসমূহ হ্রাস করতে পার। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বাণী- 'যাকে ইলমে ইয়াকীনের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে তাঁর নামাজ রোজা কম হওয়াতে কোন ক্ষতি নাই'। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা একারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)। আল্লাহ্‌র বাণীর হুকুম অনুযায়ী এদিক সেদিকের সাথে অন্তরের ভালবাসার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা তার উপর ওয়াজিব ও আবশ্যক। সত্যপন্থী মুরিদ ও সত্যবাদী খোদা তালাশকারী যা কিছু করেন তা থেকে তার মতলব ও উদ্দেশ্য আল্লাহই হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - 'হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী , আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং তাঁর কোন শরীক নাই।' (সূরা আনআ'ম)। এই লোকেরা এই বাণীর মর্মানুযায়ী- 'তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেন'। তাঁরা দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। আর তাঁদের মুখকে পরকালের দিকে ঝুকান না। তাঁদের আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য শুধু মাত্র খোদার সত্তা ও তাঁর সন্তুষ্টি।

পংক্তি

তোমার জন্যেই আমি নিবাস গড়েছি, তোমার উদ্দেশ্যে সফরের পাথেয় অনুসন্ধান করেছি,
তোমার জন্যেই আমি নিরব থেকেছি এবং তোমার জন্যেই আমি কথা বলেছি।

অতএব, যে ব্যক্তি বিনিময় ও পারিশ্রমিক আকাঙ্খী, সে পারিশ্রমিক ও বিনিময়ের বান্দা। সে হক তায়ালার বান্দা নয়। হযরত হাফেজ সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

সওয়াবের জন্য তুমি ফকিরের মত আনুগত্য করো না,
কারণ বন্ধু নিজেও দাসত্ব ও দাসত্বের উপায় এবং রীতি সম্পর্কে অবগত।

কেউ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর কাছে প্রশ্ন করলেন, আপনি ঐ ব্যক্তির ব্যপারে কি বলেন যে, তার মাঝে ও খোদা তায়ালার মাঝে কোন পর্দা নেই। কিন্তু, তার মধ্যে কিছুটা সংশয় ও দোদুল্যমানতা রয়েছে? তিনি (জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহে আলাইহি)

বলেন, 'চুক্তিবদ্ধ দাস দাসই, যদিও এক দিরহামও তার উপর পাওনা থাকে'। হে ভাই! মুরিদ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছার মৃত্যু ঘটান এবং পীরের ইচ্ছায় জীবন লাভ করেন। উক্ত পথের ভয়-ভীতি সম্পর্কে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পদক্ষেপ পুণরাবৃত্তি করেছেন। তাই হযরত রাসূলে মকবুল (দঃ) ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি যমীনের উপর হাঁটা-চলা করছে এমন মৃত ব্যক্তিকে দেখতে ইচ্ছুক, সে যেন ইবনে আবু কুহাফার দিকে দেখে' অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দিকে। ধর্মীয় বুজুর্গগণ বলেন-যে ব্যক্তি দিনে শতবার অনিচ্ছার তরবারি স্বীয় গলদেশে চালাবে না, উক্ত কাপুরুষ ব্যক্তির জন্য মুরিদীর নাম লওয়া হারাম।

কবিতা

সাদী তোমার গুপ্ত রহস্যের কথা ভাবছে, তার নিজের নয়,
ভণ্ড তাপস যে কোন জামা পরলেই তা কাফন।

এই কঠিন পথ খারাপ অন্তর নিয়ে অতিক্রম করা যায় না। নারীগণের মত শান্তি ও আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করা সেটা ভিন্ন বিষয়। আর অভ্যাসগত উৎসাহ-উদ্দীপনা যুক্ত পদক্ষেপে এবং সাধনার কন্টাকাকীর্ণ পথে নিজেকে ও সবকিছু ত্যাগ করে অতিক্রম করা অন্য বিষয়। যেই ব্যক্তি বিপর্যস্ত পরিবার-পরিজন ও এদিক সেদিকের সম্পর্কের বিচ্ছিনতাকে ভয় পায়, উক্ত হীন উদ্দীপনা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না।

কবিতা

তৌহিদের পথে দুইটি কিবলা (দিক) অনুসরণ করে কেউ সঠিক পথে
চলতে পারে না,
হয় বন্ধুর সন্তুষ্টি চাইতে হবে অথবা নিজের কামনা বাসনার অনুসরণ
করতে হবে।

মুরিদে মুন্তাহা (চুড়ান্ত পর্যায়ের মুরিদ) তাঁকে বলে, যিনি উক্ত দুইটি স্তর অতিক্রম করার পর মোজাহাদায়ে নফ্স ও মোশাহেদার স্তরে পৌঁছেছেন। কেননা মোশাহেদা হল- মোজাহেদার উত্তরসুরী। আর ইলমুল ইয়াকীন ও আইনুল ইয়াকীন স্তর অতিক্রম করে হক্কুল ইয়াকীন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং শাহেদ (দর্শনকারী) এর মর্মার্থের মূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আর হালের অধিকারী হয়ে গেছেন। এই হাল অবস্থায় কখনো কুদরতের কর্মস্থলে তাকে ইহা পরিচালিত করে। তখন সর্বদা স্বীয় মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর স্মরণে তাঁর ভরসায়, তসলিম (আত্মসমর্পণ), রেজা (সন্তুষ্টি), সমর্পন , দেহতত্ত্ব পাঠ এবং মোরাক্বাবায় নিজের প্রিয় মুহূর্তগুলো ব্যয় করেন। অতএব, সুলুকের প্রারম্ভ হল

তপস্যা ও খোদাভীতি এবং উহার শেষ হল রেজা, তাসলিম ও তাওয়াক্কুল (ভরসা)।

কবিতা

তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হও এবং কপালের গিঁট খুলে দাও
অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। কারণ আমাকে ও
তোমাকে কৃর্তত্বের লাগাম দেয়া হয়নি বরং কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র হাতে।

কবিতাংশ

আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, তাহলে তাকদির (ভাগ্যলিপি) কি?

সেই সময় মিলনের কোমল হাওয়া দ্বারা কখনো হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হয় এবং কখনো জালালিয়তের ক্রোধ দ্বারা ক্রন্দনরত ও পেরেশান হয়ে যায়। আর বলতে থাকে-

কবিতা

আমরা প্রেমিকগণ ব্যকুল ও অস্থির আমাদের লিখার কলম ইশকে দগ্ধ।
আমরা ইশকের আগুনে জ্বলছি-বন্ধুর গলি পথে বঞ্চনা নিয়ে ঘুরি।

আর কখনো তাকে উহা থেকে (হাসি-কান্না) বিরত করা হয় এবং তার (মুরিদ) উদ্দেশ্যের লাগামকে উম্মাদনার জজ্‌বার লাগামে সোপর্দ করা হয় । আর সমস্ত পৃথিবী ও পৃথিবাসী হতে তিনি এক পেশে হয়ে যান। যেন তিনি (মুরিদ) একজন বিধবা নারী, সিংহপুরুষ মানুষটি তাকে দেখে লজ্জা পায়। যেন সে (মুরিদ) একজন গাফেল (উদাসীন), তাকে দেখে সচেতন ব্যক্তির লজ্জা আসে। যেন সে অন্ধ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তার মোকাবিলায় কোন শক্তি রাখে না এবং নির্বাক হয়ে যায়। বাক্‌সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং বধির হয়ে যায়। শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষতার সাথে দম ফেলতে পারে না । আল্লাহ্‌র বাণী- 'বধির, বোবা ও অন্ধ। অতঃপর তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।' (সূরা বাকারা)। ইহা তার হাল (অবস্থা) এর বর্ণনা।

কবিতা

হে সাদী! সূর্যের কাছে আদব এটা বলা যে,
আমরা কখনো অন্ধকার রাত দেখিনি।

এই অবস্থায় নিয়মনীতি ও অভ্যাস একেবারে তাঁর থেকে ছুটে যায়। বরং ভুলেও উহার খেয়াল আসে না এবং আল্লাহ্‌র খেয়াল ব্যতিত পরিপূর্ণভাবে উহা চিন্তা করে না। আল্লাহ্‌র বাণী- 'বলুন! সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসৃত।' (সূরা বণি-ইসরাঈল)। আর প্রকাশ্যভাবে তারা (মুরিদ) পেরেশানী অবস্থায়

থাকেন এবং বাতেনীভাবে তারা খোদার মিলনের নেয়ামত দ্বারা সম্পদশালী হয়ে যান। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী, 'রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে।' (সূরা নমলঃ ৩৪)।

পংক্তি

বায়তুল মুকাদ্দাসের মত তার অন্তর উজ্জ্বল,
আর বাইরের প্রাচীর সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অর্থাৎ 'দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা' এই বাণীর হুকুম অনুযায়ী এই সীমাবদ্ধতা ও প্রথাগত অনুসরণ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইশকের জালালিয়তের প্রাধান্য এবং সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হাকিকি তাওহীদের শরাব এর মাতলামি দ্বারা খারাপ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত নিগুঢ় অর্থের স্বভাব-প্রকৃতি; যেটি উত্তম রত্নে লুকায়িত ও প্রোথিত, ইহা কখনো প্রকাশ্যে আসবে না।

পংক্তি

যে ক্ষতিগ্রস্থ দ্বারা পরীক্ষিত হয় না, সে ধর্মহীন।
কারণ ক্ষতিগ্রস্থের সম্মুখীন হওয়া ধর্মের রীতি।

সেই সময় ইশকের অস্বীকার পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়। ক্বলন্দরি পোশাক তাঁর দেহের উপর সুন্দর ও সঠিক মনে হয়। আর সমস্ত কুদরতের কর্মশালা; যেটি কাফিরদের জন্য বেহেশত তা সতেজ ও উজ্জ্বল দেখা যায়। সমস্ত দুনিয়া তার কাছে চির বসন্ত মনে হয়। আর সর্বদা বন্ধুর মিলনের শরাব দ্বারা মাতাল ও পূর্ণ থাকে। বলতে থাকেন-

কবিতা

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অবিশ্বাসী হবে না, তুমি ততক্ষণ ইশকের ক্রেতা নও,
যতক্ষণ পর্যন্ত মুরতাদ (ধর্মহীন) হবে না, ততক্ষণ ক্বলন্দরী তোমার কাজ নয়।

হাফেজ সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

পংক্তি

ইশকের কারখানায় অবিশ্বাস অনিবার্য,
যে আগুন তোমাকে দহন করে যদিও সেটা জ্বলে না।

হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

ইশকের সম্পর্ক অবিশ্বাসের সাথে,

প্রেমিকের অবিশ্বাস হল আসল দরবেশি।

হযরত আমির খসরু (রহমতুল্লাহে আলাইহি বলেন)-

কবিতা

আমার ভালবাসা কাফের (অবিশ্বাসী), মুসলমানীত্ব আমার দরকার নাই-
আমার প্রতিটি শিরা তার হয়ে গেছে, কাঁটার প্রয়োজন নাই।

অন্য একজন বুজুর্গ বলেন-

তোমার কোঁকড়া চুল যখন আমি দেখেছি তাতে আমার হৃদয় হয়ে গেল বন্দি-মুসলমানদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে আমার বিশ্বাসের জন্য কটাক্ষ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলাম।

হযরত হাসান আলী সাঞ্জারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

হাসানের বিরহ বেদনার জন্য তিরষ্কার ও বিদ্রুপ কি ভূমিকা রাখতে পারে?
ইশকের পরিণাম সম্পর্কে আশংকা করা কারো উচিত নয়।

আল্লাহ তায়ালার কাছে পৌঁছার পর মূল কাজ হল আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করা। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আল্লাহ ব্যতিত সবকিছু থেকে নির্জনতা অবলম্বন করা। আল্লাহর কাছে বান্দার পৌছার মর্মার্থ হল-ফানা (বিলীন) হয়ে যাওয়া এবং পার্থিব সম্পর্কের বন্ধন, পার্থিব উপকারিতা, ক্ষতি, প্রশংসা, নিন্দা, সৃষ্টির অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা, নফ্সের প্ররোচনা এবং স্বীয় কামনা-বাসনা থেকে মুমিন বান্দা বের হয়ে যাওয়া। আর দৃঢ় থাকা আল্লাহর ইচ্ছা ও কর্মের উপর। নবীগণ (আঃ) ও আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এঁর প্রত্যেকদের সাথে আল্লাহ্র আলাদা আলাদা রাজ-রহস্য বিদ্যমান ছিল। উক্ত নবী ও আউলিয়া ব্যতিত ইহা (রাজ-রহস্য) অন্যদের জানা নেই। এমনকি আল্লাহ্র সাথে মুরিদের যে রাজ-রহস্য রয়েছে যা কখনো তার মুর্শিদের জানা হয় না। অনুরূপভাবে স্বীয় শায়খের রাজ-রহস্যের ব্যাপারে মুরিদের কোন খবর থাকে না। যখন মুরিদ স্বীয় যোগ্যতা বলে স্বীয় শায়খের স্তরে পৌঁছে যান, তখন মুরিদ শায়খ থেকে আলাদা ও পৃথক হয়ে যান এবং শায়খের প্রয়োজন হয় না। তারপরও আদব বজায় রাখা, হক্ব স্বীকার করা, নিয়ামতের শোকরিয়া করা তাঁর (মুরিদ) উপর ওয়াজিব ও আবশ্যক।

কবিতা

হে ভোরের বাতাস! হাফেজ সিরাজী শায়খুল ইসলাম আহমদ নামেকী জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) (৪৬১-৫৩৬ হিঃ) এঁর মুরীদ, তুমি যাও এবং শেখ আহমদ জামের কাছে গোলামের পক্ষ থেকে আমার দাসত্ব পৌঁছিয়ে দাও।

ইশকে উদ্দীপ্তকারী যদিও কুৎসিত ছিল,
কিন্তু নির্জন ঘরে সে প্রেমাস্পদ ছিল।

যখন আল্লাহ্‌র দিকে পথচলা সম্পন্ন হল এবং আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছার বা মিলনের সৌভাগ্য দ্বারা সুশোভিত হল, তখন সালেক পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে গেল এবং বেলায়তের সীমারেখায় প্রবেশ করল। আর বাক্বার সৌভাগ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হল। সেই সময় সায়ের ফিল্লাহ আরম্ভ হয় এবং নুরে মোহাম্মদীর (দঃ) অসিলায় আল্লাহ্‌র বিভিন্ন তাজল্লীর (নুরের দ্যুতি) শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণতা স্তরে পৌঁছানো হয়। আর আল্লাহ্‌র কুদরতের হাত মোবারক তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার জিম্মাদার ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায়। ইহাতে বান্দার অকাট্যভাবে এখতিয়ার (স্বাধীনতা) ও তদবির বাকি থাকে না। বরং সব বিষয় ও কথা থেকে ফানা (বিলীন) হয়ে যান। আর হাল (অবস্থা), মকাম (স্তর), ইরাদত (ইচ্ছা) ও ইখতিয়ারের (স্বাধীনতা) ব্যাপারে খবরহীন ও অনবগত হয়ে যায়।

কবিতা

দূরত্বে দূরত্ব বাড়ে- সম্বন্ধে সম্বন্ধ বাড়ে।
যে ব্যক্তি ফকিরদের (অলি) চলন ভঙ্গিতে লয়প্রাপ্ত হয়,
নাই সেখানে জ্ঞান, ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) মা'রিফত ও ধর্ম। অর্থাৎ কেবল আল্লাহই থাকে।
তার থেকে সব চলে গেল, কেবল খোদা রয়ে গেলেন,
যখন ফকিরি (খোদা মুখাপেক্ষীতা) পূর্ণতা লাভ করে,
তখন আল্লাহই বাকি থাকে।

সেই সময় তাঁর (মুরিদ) অবস্থা সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি এবং চিরন্তন অভিযোজন আল্লাহ্‌র কাজ ও ইচ্ছার সাথে হয়ে থাকে। আর ইহা আউলিয়া ও আবদালের অবস্থা সমূহের চুড়ান্ত পর্যায়। আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় ফরতু (রশ্মি): সুলুকের সাতটি স্তরের বর্ণনা প্রসঙ্গ

হে প্রিয় বন্ধু! এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হল হাল (অবস্থা), অপরটি হল মকাম (স্তর)। কোন প্রকারের গুনমান যেমন তলব (খোদা তালাশ) ও ইশক (প্রেম) ইত্যাদি অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হওয়াকে 'হাল' বলা হয়। আর মকাম হল উক্ত 'হাল' এর মূল শক্তির নাম। 'হাল' এর অধিকারী অনেক ব্যক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মকাম এর অধিকারী অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। হযরত মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

সূফিগণের মধ্যে হাল এর অধিকারী অনেক রয়েছেন।
কিন্তু তাদের মধ্যে মকাম এর অধিকারী বিরল।

সুলুকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাতটি স্তর রয়েছে। হযরত মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উক্ত সাতটি স্তরের বিশদ বিবরণের উপর মছনবী শরীফের ছয়টি দফতরকে সীমাবদ্ধ করেছেন। উক্ত স্তর সমূহ থেকে প্রথম স্তর হল তলব (তালাশ করা)। খোদা অনুসন্ধানী ব্যক্তি সর্বদা আশার পাথেয় নিয়ে পেরেশান থাকে। আবেগের অতিশায্যে বিপদাপদ যা আসে উহাতে আনন্দিত ও খুশি থাকে। বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম ও অত্যন্ত চেষ্টা করা উচিত যাতে 'হাল' অর্জিত হয়। জান-মাল, সম্মান ও মাহাত্ম্যকে একেবারে ডুবানো উচিত যাতে পরিপূর্ণভাবে বন্ধুর সাথে মিলন ঘটে। প্রত্যেক নফ্সকে (ব্যক্তি) খোদা ভিন্ন অপরাপরদের বিপদ থেকে অন্তঃকরণে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সতর্ক থাকতে হবে। আর প্রত্যেক অবস্থায় আশা নিরাশার মধ্যে থাকবে।

কবিতাংশ

পূণ্যবানদের পথ আশা ও ভয়ে ভরা।

যখন অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহ ভিন্ন সমস্ত বস্তু থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা থেকে অন্তরে নুর আসতে শুরু করে তখন একটি তলব (চাওয়া বা অনুসন্ধান) তার হাজার তলব হয়ে যায়। যেমন যদি তার পথে হাজার জাহান্নাম, আগুন ও মানুষ খেকো স্থানও হয়, তবুও তার তলবের পতঙ্গবৎ ইচ্ছা ও ইব্রাহিমী আগ্রহের মোকাবিলায় বসন্তের বাগান হয়ে যায়। যদি উক্ত আকাঙ্খা ও তলবের শরাব থেকে এক চুমুকও তোমার পান করা হয়, তাহলে সমগ্র পৃথিবী ও দুনিয়াবাসী তোমার অন্তর থেকে ভুলে যাবে। সেই সময় যদি কুফর ও অভিসম্পাত পরস্পর এগিয়ে আসে, তবুও প্রকৃত রহস্য

অনুসন্ধানকে ছাড়বে না। মস্তক ভেঙ্গে গেলেও প্রিয়তমের রহস্য জানা থেকে মুখ ফিরাবে না।

মসনবী

কুফর (অবিশ্বাস) ও অভিসম্পাত যদি তোমার সামনে আসে,
তবে প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধান থেকে তোমাকে বিরত করতে পারবে না।
যখন তোমার মধ্যে প্রকৃত রহস্য উম্মোচিত হবে, তখন অবিশ্বাস কি এবং ধর্ম কি বিষয়?
তাছাড়া প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধানে থাকা, না থাকা কি বিষয়?

হযরত ওসমান মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) "গঞ্জনামা" গ্রন্থে তা লিখেছেন এবং ইহাকে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'মানতিকুত্তায়র' গ্রন্থে উদ্ধৃত সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, যখন খোদা তায়ালা মাটির আদম (আলাইহিস্সালাম) কে 'তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব।' (সূরা হিজর: ২৯)-এই বাণীর মর্ম মতে রূহ ফুঁক দিয়ে স্নেহাস্পর্শ করলেন এবং ফেরেশতাগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। আর আদম (আলাইহিস্সালাম) কে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সমস্ত ফেরেশতা হযরত আদমকে (আলাইহিস্সালাম) সিজদা করেন। ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর গুপ্ত বিষয়াদির ব্যাপারে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু অভিশপ্ত ইবলিশ বলতে লাগল- যদি আমার মাথা উড়ে যায় তারপরও এই মাথাকে ছাড়ব না। আমি জানি যে, আদম মাটির মূর্তি নয়। যদি মস্তক উড়ে যাওয়ার পর যদি মস্তক অর্জিত হয় তাহলে কোন ক্ষতি ও ভয় নাই। মূলত ইবলিশ আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর গুপ্ত রহস্যেরে ব্যাপারে অবগত এবং আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর রাজ-রহস্যের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে (ইবলিশ) বললেন, হে গুপ্তচর ও রাস্তার চোর! তুমি আমার গোসল খানার গুপ্তরহস্যের গুপ্তধনকে চুরি করেছ। অথচ গুপ্তধন চোরদের থেকে গোপন থাকা বিধি সম্মত। যখন তুমি আমার গুপ্ত রহস্যের গুপ্তধনের ব্যাপারে অবগতি লাভ করেছ এবং আমার গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধান করেছ। তাই আমি তোমাকে হত্যা করব। যাতে আমার গুপ্তধন গোপন থাকে। সেই সময় ইবলিশ আরজ করল-হে প্রভু! আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ চাই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- যদি তুমি প্রাণভিক্ষা চাও, আমি তোমাকে অবকাশ ও মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু আমার অভিসম্পাতের গলাবন্ধ তোমার ঘাঁড়ের হার বানালাম এবং তোমার নাম মিথ্যাবাদীদের দপ্তরে লিখলাম। যাতে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়

তোমাকে মিথ্যাবাদী ও অভিযুক্ত জানে। আর তোমার কথা কেউ যেন না মানে যাতে আমার গুপ্ত বিষয়াদির গুপ্তধন সুরক্ষিত থাকে।

পংক্তি

আমি চাই তোমার (ইবলিশ) নাম মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হোক,
যাতে তুমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিযুক্ত থাক।

ইবলিশ বলল, হে প্রভু! যখন আমার কাছে পবিত্র গুপ্ত রহস্যের গুপ্তধন উদ্ভাসিত হয়ে গেল, তখন অভিসম্পাতের ভয় কিসের? রহমত ও অভিসম্পাত উভয়টি আপনার সৃষ্টি এবং আপনার হুকুম। আর বান্দা হুকুমের দাস। যদি আমার ভাগ্যে আপনার লা'নত (অভিসম্পাত) থাকে তাহলে ভয় নাই। কেননা আপনার বিষতুল্য অভিশাপের অন্য কারো নেশা নেই। যখন আপনার অভিশাপের অন্য কোন ক্রেতা নেই, যখন অভিশাপটি আপনারই অভিশাপ, তখন আমি দূর্গন্ধযুক্ত বান্দার তা পছন্দ।

কবিতাংশ

তাহলে আমি আপনার গর্ববোধ করব,
কেননা আপনি গর্বের অধিকারী।

হে প্রিয় বন্ধু! এইরূপ তোমারও আগ্রহ ও তলব (চাওয়া) দমে যাওয়া উচিত নয়। কুফর ও অভিশাপ সম্মুখে উপস্থিত হলেও মকসুদ (উদ্দেশ্য) হাসিলের মকাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়।

পংক্তি

এভাবে ইশকের অনুসন্ধানকারীর অনুসন্ধান করা উচিত,
হে অনুসন্ধানী! তুমি ইশকের অনুসন্ধানে বিজয়ী হতে নাও পার,
তারপরও হাল ছেড়ে দিবে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত শিবলী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) রূহ কবজের সময় প্রিয়তমের সাক্ষাতের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কোমরে বিহবলতার বেল্ট বেঁধে ছাইয়ের একটি স্তুপের উপর বসে গেলেন এবং স্বীয় মাথার উপর মাটি উঠাতে লাগলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাস করলেন, হে হযরত! কাউকেও এই রূহ কবজের সময় কখনও বেল্ট বাঁধতে দেখেছি, যা আপনি বেঁধেছেন? তিনি (শিবলী রহমতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, আমার অক্ষমতা ক্ষমা কর। এই সময় আমার প্রাণ ইবলিশের ঈর্ষার আগুনে জ্বলছে। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী- 'নিশ্চয় আমার অভিশাপ।'-এই বাণীর সম্বোধন তার (ইবলিশ) ভাগ্যে জুটেছে। আর উক্ত আয়াতে 'ইয়া' বর্ণ উত্তম পুরুষ; যার সম্বন্ধের আস্বাদন সে (ইবলিশ)

উপভোগ করেছে। তালেব (খোদা তালাশকারী) এর উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ মাটির দেহপিঞ্জরে থাকবে বন্ধুর অপেক্ষায় সর্বদা অশ্রুসজল থাকবে। আর প্রতি নিঃশ্বাসে তলব (চাওয়া) এর পথে প্রাণ উৎসর্গ করতে থাকবে। এইভাবে যে, এক মুহূর্ত চাওয়া থেকে স্থির হবে না এবং তার চাওয়া থেকে বিশ্রাম নেওয়া ও তুষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর চাওয়া থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত খারাপ। বরং সে চাওয়ার পথে সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায়। উচিত যে, চাওয়া-পাওয়ার যত পদ্ধতি আছে সবটাই প্রয়োগ করবে।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত মজনুন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) রাস্তার মাটি অনুসন্ধান করছেন এবং উহার মধ্যে কিছু খুঁজতেছেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল- আপনি কি খুঁজছেন? তিনি বললেন, লায়লাকে খুঁজছি। লোকটি বলল, মানুষও কি রাস্তার কোথাও ধূলো বালিতে লুকিয়ে থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, যদিও মানুষ রাস্তার কোথাও ধূলো-বালিতে লুকিয়ে থাকে না, তারপরও ইশকের জন্য শর্ত এই যে, আশেক বন্ধুর খুঁজে কোন পদ্বতিকে ছাড়বে না। জানা নেই যে, মাশুক কোন তলব (চাওয়া) এর উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং উদ্দেশ্যের সূর্য কোন চাওয়ার উদয়স্থল থেকে উদিত হবে।

হযরত ইউসুফ হামদানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, আরশ থেকে পরশ (পৃথিবী) পর্যন্ত প্রত্যেক কণা নিজ নিজ হারিয়ে যাওয়া ইউসুফের খুঁজে ও অনুসন্ধানে ইয়াকুবের মত নিপুণ জুলাইখার মত অস্থির ও হতভম্ব। খোদার পথের অনুসন্ধানকারীকে চাওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ধৈর্য্য ও সুউচ্চ সাহস দরকার। যেই অনুসন্ধানের রন্ধ্র থেকে বাঞ্ছিত চেহারা দেখা দেয়, জান গেলেও উহাকে ছাড়বে না।

বর্ণিত আছে যে, এক রাতে হযরত সুলতান মাহমুদ গাজী গজনবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে কোন একদিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন যে, একটি পাহাড়ের পাদদেশে একজন দরিদ্র ব্যক্তি মাটি তালাশ করছেন এবং মাটির মধ্যে রত্নের কণা খুঁজছেন। বাদশাহ তার কষ্ট দেখে দয়া আসল এবং স্বীয় সৈন্য সামন্তদেরকে লুকিয়ে রেখে স্বীয় ব্রেসলেট (করভূষণ); যার মূল্য পৃথিবীর করের (tax) সমতুল্য উক্ত মাটিতে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন রাতে পুণরায় বাদশাহ উক্ত স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, উক্ত মাটি তালাশকারী ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত স্বীয় কাজের মধ্যে রত। বাদশাহ বললেন, হে মাটি তালাশকারী! গতকাল রাতে তুমি যে ব্রেসলেট পেয়েছ ইহার মূল্য পৃথিবীর করের (tax) চেয়ে ঢের বেশি । আপনি এখনও মাটি তালাশ করছেন? মাটি

তালাশকারী উত্তর দিল, হে হযরত! এই কাজ দ্বারা মূল উদ্দেশ্যের দ্বার উম্মোচন অর্জিত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণ থাকে আমি উহা ছাড়ব না। মূল উদ্দেশ্যের দ্বার কারো জন্য বন্ধ নয় । অতএব, অনুন্ধানকারীর স্বীয় অনুসন্ধানে পূর্ণ সাহস ও উদ্যম থাকা উচিত। বর্ণিত আছে যে, একদিন কেউ আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করছিলেন- হে আল্লাহ! উদ্দেশ্যের দ্বার আমার জন্য খুলে দাও। হযরত রাবেয়া বসরীয়া আদবিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে গাফেল (অসচেতন)! এই দ্বার কখনো কারো জন্য কি বন্ধ ছিল; যা তোমার জন্য খুলে দেয়া হবে?

কবিতা

হে ব্যক্তি! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সামনে এই মা'রেফতের দরজা উম্মুক্ত,
তবে এই পথ থেকে স্বীয় মুখ ফিরাবে না।
যাতে এই রাস্তা দেখে নাও, যেটি বন্ধ নয়।
তোমার চোখ ব্যতিত কোন কিছু বন্ধ নয়। তুমি অনুসন্ধান কর,
কেননা এই রহমতের দরজা বন্ধ নয়।

দ্বিতীয় মকাম (স্তর) হল- ইশক (প্রেম)। যখন সালেক উক্ত স্তরে পৌঁছেন তখন ইশকের আগুনের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যান। সেই সময় না তার দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির খবর থাকে এবং না তাকে শেষ পরিণতির ভয় ভাবিয়ে তুলে। না তার কুফরি ও দ্বীন ইসলামের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং না তিনি সংশয়কে সংশয়হীনতা থেকে শ্রেষ্ঠ জানেন। বরং পূণ্য ও পাপ তার কাছে এক সমান দেখা দেয়। জান-মাল, অর্থ-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, সবকিছু বেছাল (খোদা মিলন) এর মোকাবিলায় তুচ্ছ মনে করেন এবং এইগুলো তার কাছে কোন প্রকার মূল্যমান রাখে না। অন্তরের মধ্যে এমন অস্থিরতা ও ইন্দ্রিয়াবেগ হয় যেমন পানি বিহীন মাছ যতক্ষণ পর্যন্ত পানি পর্যন্ত পৌঁছে না স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না। অনুরূপভাবে, ইহাও (ইশক) যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদের মিলনের ধন দ্বারা সমৃদ্ধশালী হবে না, ততক্ষণ প্রশান্তি পাবে না। ইশকের একটি সামান্য কারিশমায় বুদ্ধি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। যিনি অদৃশ্য থেকে অন্তর দৃষ্টি প্রাপ্ত হন তিনি তা বুঝে থাকেন। বরং সমস্ত বিদ্যমান বস্তু আল্লাহ্‌র ইশকের ফয়জ দ্বারা অস্তিত্ববান। যদি অন্তরের চোখ অদৃশ্যের দৃষ্টি শক্তি দ্বারা আলোকিত হয়, তখন প্রকৃত রহস্য ও 'ইশক তিনি আল্লাহই' এর মর্মার্থ তোমার উপর স্পষ্ট হবে। ইশকের শুরু শেষ নেই । ইশকের খেলা হল জীবন বাজি রেখে চেষ্টা করা। যে ব্যক্তি জীবন বাজি রাখে না সে ইশকের রাস্তায় মিথ্যাবাদী। হযরত সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্বীয় চিন্তায় দিনাতিপাত কর,
তখন ইশকের দাবী করা মিথ্যাচার হবে।
যদি বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না হয়,
তাহলে ইশকের অনুসন্ধানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য।

তৃতীয় মকাম (স্তর) হল- মা'রেফত। জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌র মা'রেফতের রাস্তা অনেক। কেননা আল্লাহ্‌র নৈকট্যের রাস্তা সমূহ সৃষ্টি জীবের নিঃশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ। উক্ত অতল সমুদ্রের তলদেশ আজ পর্যন্ত কোন চরণ ও সাতারু পায়নি। যে ব্যাপারে সরওয়ারে কায়েনাত সৈয়দুল মজুদাত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আপনার যথাযথ পরিচিতি আমরা লাভ করিনি। অতএব, অন্যদের ব্যাপারে কি উল্লেখ করব'? আল্লাহ্‌র বাণী- "হে আমার প্রভু আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (সূরা তাহা)- এই বাণীর শ্লোগান গভীর সমুদ্রের তৃষ্ণার ব্যাপারে ইঙ্গিতবহ। উক্ত স্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ পূর্ণ যোগ্যতা অনুযায়ী বাস্তব সম্মতভাবে নির্ধারণ হয়।

পংক্তি

প্রত্যেককে ইশকের পথে স্বীয় পূর্ণতার উপর ভিত্তি করে পথ চলা উচিত-
স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেককে এই পথে নৈকট্য অর্জন করতে হবে।

কারণ, মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তিদের পরিভ্রমন এবং তাদের মা'রেফতের পদ্ধতি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন। সেই জন্য প্রত্যেকের মা'রেফত আলাদা। যখন সালেক মা'রেফতের স্তরে পৌছেন তখন স্বীয় মাশুক (বন্ধু) ছাড়া অন্য কিছু দেখে না।

পংক্তি

যদি সে কিছু দেখে তবে তাঁর (প্রেমাস্পদ) চেহারা দেখে,
তাঁর পথের প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা সে সর্বদা অবলোকন করে।

এই স্তরে জাগ্রত অন্তর হাল (অবস্থা) এর জন্য আবশ্যক থাকে। ইহার কারণে প্রেমাস্পদের গুপ্ত রহস্যের সমুদ্র সালেকের অন্তর এমন হিল্লোলিত করে যে, উহার উপভোগ ও আগ্রহের একটি প্রাণ হাজার প্রাণ দ্বারা উৎসর্গিত হওয়াতে কোন হাকিকত (বাস্তবতা) রাখে না। হে প্রিয় বন্ধু! মা'রেফতের সম্পদ ও ইরফান (মা'রেফত) এর নিয়ামত বড় সম্পদ ও বড় নিয়ামত। ইহকাল ও পরকালে উহার সমকক্ষ কোন সম্পদ ও কোন নিয়ামত নাই। যে এই সম্পদ ও এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত, ধূলোবালি তার মাথার উপর পতিত। যে ব্যক্তি মা'রেফতের অধিকারী নয়, প্রকৃতপক্ষে সে শোক

প্রকাশকারী। যদি বন্ধুর মিলনের আনন্দের নিয়ামত অর্জন একবার না হয়, তাহলে বিরহ বিচ্ছেদের শোক তার জন্য আবশ্যকীয় ফরজ।

মসনবী

নিজেকে মা'রেফতের সমুদ্রে নিমজ্জিত কর,
আর তাঁর পথের মাটির উপর বিদ্যুতের মত চমকাতে থাক।
যদি তুমি মা'রেফতের ব্যাপারে বেখবর নও,
তবে কেন নিজে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ না?
যদি তোমার কাছে স্বীয় বন্ধুর মিলনের আনন্দ না হয়,
তবে তুমি দাঁড়িয়ে যাও এবং বিচ্ছেদের বেদনায় আহাজারি কর।
যদি তোমার কাছে স্বীয় বন্ধুর দিদার (সাক্ষাত) ভাগ্যে না জুটে,
তবে তুমি দাঁড়িয়ে যাও। আরামে বসে থেকো না,
তাঁর দিদার তালাশ কর ও সাক্ষাত কামনা কর।
যদি তোমার তাঁর কামনা না থাকে, তবে স্বীয় এই অবস্থার জন্য লজ্জিত হও।
গাধার মত কত দিন লাঞ্ছিত রবে?

চতুর্থ স্তর হল- ইসতিগনা (অমুখাপেক্ষিতা)। ইহা এমন একটি স্তর যদি উক্ত অমুখাপেক্ষী জগতের একটি সামান্য বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে উভয় জগতের রাজ্য সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সাত সমুদ্র উক্ত সমুদ্রের একটি বিন্দুও নয়। সাত আকাশ ও উহার নক্ষত্ররাজি উহার একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়। আট বেহেশত ও সাত দোযখ উক্ত স্তরে হাকিকতহীন (বাস্তবতাহীন)। একটি লেংড়া পিপড়া লক্ষ লক্ষ পাগলা হাতি থেকে উক্ত স্তরে কোন অংশে কম নয়। খোদার দরবারে লক্ষ লক্ষ ফেরেশতাদের অন্ধকারময় স্থান 'আমরা জানি না' এর মধ্যে মুখ লুকানো উচিত, যাতে একটি মাটির মূর্তি জ্ঞানের প্রদীপকে আলোকিত করে।

লক্ষ লক্ষ কিনআন খোদার ক্রোধের তুফানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া চাই, যাতে একটি নূহের হেদায়তের নৌকা সালামত (শান্তি) নামক জুদী পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। লক্ষ লক্ষ অভিশপ্ত নমরুদ খোড়া মশার খাবার হওয়া উচিত, যাতে একজন ধার্মিক খলিল কুফরি ও পথভ্রষ্টতার আগুনকে হেদায়ত ও মা'রেফতের চির বসন্তের বাগান বানিয়ে দেন। লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ ও মুক্তি পাওয়া শিশু নির্লজ্জ ফেরআউনের ক্রোধের নীল নদে ধবংস হওয়া উচিত, যাতে একজন কলিমুল্লাহ তুর পর্বত সম স্তর সমূহে পৌঁছতে পারেন। লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের কুফরির ক্রুশ চিহ্ন বিশিষ্ট বেল্ট কোমরে বাঁধা উচিত, যাতে একজন ঈসা (আলাইহিস্সালাম) গুপ্ত রহস্যের আসমানে আগমন করেন। লক্ষ লক্ষ সৃষ্টির মস্তক অমুখাপেক্ষিতার তরবারি দ্বারা উড়ে যাওয়া এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া

চাই, যাতে একজন লাজুক মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর 'আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্ছ করেছি।' (সূরা ইনশিরাহ: ৪)- এই আয়াতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর মে'রাজ হাসিল হয়। এখানে উচু নিচু এবং নতুন পুরাতন সব সমান। কুন (হয়ে যাও), মকুন (হয়ো না) এর কোন হাকিকত বা বাস্তবতা নেই। এখানে সৌভাগ্য দূর্ভাগ্যের অনুরূপ বর্ণ এবং দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের অনুরূপ বাহু। 'অতএব, আল্লাহ তায়ালা জগতসমূহের অমুখাপেক্ষী।' (সূরা আলে ইমরান)। সেখানে তিনি (আল্লাহ) না কারো সৎকর্ম দ্বারা খুশি ও আনন্দিত, না কারো অসৎকর্ম দ্বারা পেরেশান ও আঘাত প্রাপ্ত। যদি উক্ত দরবারে হাজারো প্রাণ ধ্বংস হয়ে যায় একবিন্দু শিশিরের অতল সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কোন হাকিকত (বাস্তবতা) রাখে না। যদি আসমান যমীন সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায় অথবা একমাস থেকে অন্য মাস একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এখানে এক অনু একটি পৃথিবী থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মত কোন পার্থক্য তৈরী করে না। সুবহান আল্লাহ তাঁর শান কত মহান।

পঞ্চম স্তর হল তাওহীদ এর স্তর। উক্ত স্তরের দুই এর রং পরিপূর্ণ থাকে না। আমি ও তুমির আবরণ পরিপূর্ণ উঠে যায়। বরং আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর নাম ও চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত লোক একটি মাত্র জামার কলার থেকে মাথা বের করে। কলমায়ে তৌহিদের সত্যাসত্য উক্ত স্তরে প্রকাশিত হয়। যদি হাজার হাজার বছর মানুষ ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, নামাজ-রোজা, হজ্জ ও যাকাতে জীবন অতিবাহিত করে, যতক্ষন পর্যন্ত তাওহীদ পূর্ণ হবে না সব কিছু নষ্ট ও উপকারহীন হয়ে যাবে। সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর রূহ (আত্মা) হল তাওহীদ এবং ইহাই যথেষ্ট।

পংক্তি

যে ব্যক্তি একত্ববাদের সমুদ্রে হারিয়ে যায়নি, সে প্রকৃত পক্ষে মানব নয়।

ষষ্ঠ স্তর হল হেইরাৎ (বিহবলতা)। উক্ত স্তরে মানসিক বেদনা ও অনুতাপ ব্যতিত কোন কিছু থাকে না। আহ্, অনুতাপ, মানসিক বেদনা ও অন্তর্জ্বালা এই পরিমাণ প্রাবল্য হয় যে, প্রতিটি লোমকূপ থেকে ব্লেড ও তরবারি ব্যতিত রক্তের ফোয়ারা বের হয়। যখন সালেক উক্ত স্তরে পৌঁছেন, যা কিছু তৌহিদের ধারক (আল্লাহ) তার মন ও প্রাণের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যায়। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি আছ? অথবা জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি মধ্যখানে আছ? অথবা তুমি কি শেষ সীমায় আছ? অথবা প্রকাশ্যে আছ? অথবা তুমি কি অপ্রকাশ্যে আছ? অথবা তুমি কি ফানা (লীন) অর্জনকারী? অথবা বাক্বা অর্জনকারী? অথবা ফানা ও বাকা উভয়ের অধিকারী?

অথবা কোন কিছুই নও? অথবা তুমি কি কাফির? অথবা মুসলমান? তখন তিনি মূলতঃ কোন কিছুই বলতে পারেন না। উক্ত স্তরে সবকিছু দেখেন, তা সত্ত্বেও তিনি কোন কিছুই দেখেন না। আর সবকিছু শুনে থাকেন, তাসত্ত্বেও কোন কিছুই শুনেন না। কেউ তো উক্ত স্তরে পরিপূর্ণ অজ্ঞাত ও নিশানাহীন হয়ে জীবন কাল ব্যাপী থেকে যান। কারো প্রতি পীরে কামেলের শুভ দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহ হাল (ভাব বিভোর অবস্থা) এর অধিকারী করে দেয় এবং দ্রুত তাকে ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তি দেন।

সপ্তম স্তর হল ফক্বর (ফকিরী বা দরবেশি) ও ফানা (বিলীন)। উক্ত স্তরে সূক্ষ্ম বুদ্ধি তন্ময় ও অনুভুতিহীন। ফানা স্তরে কথোপকথন অসিদ্ধ। উক্ত স্তরের হাকিকত (বাস্তবতা) হল নিরবতা, বাকহীনতা, নিদ্রা ও বেহুশী। লক্ষ লক্ষ ছায়া একই সূর্যের জলওয়া (দ্যুতি) দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত। সমুদ্রে ঢেউ এর আঁছড়ের কখনো কি প্রমাণ আছে? সমুদ্রের বুদ্বুদ শব্দের পরে ভাঙ্গনের কি কোথাও চিহ্ন দেখা যায়? যা কিছু থাকে সমুদ্রই কেবল বিদ্যমান থাকে। কাষ্ঠ ও জ্বালানী যখন আগুনে দগ্ধ হয়ে ছাই হয়ে যায়, অতঃপর পার্থক্য করার কোথাও কি অবশিষ্ট থাকে? ময়লা যখন কুল কিনারাহীন সমুদ্রে হরিয়ে যায়, তখন পঁচা কাদা হয়ে সমুদ্রের গুণ ধারণ করে। এখানে হারিয়ে যাওয়াটাই মূল কর্মনীতি। অনুরূপভাবে, নিজের আধ্যত্মিক পরিভ্রমণ সম্পর্কে তোমার খবর থাকে না।

পংক্তি

তুমি একত্ববাদের সমুদ্রে হারিয়ে যাও, কেবল ইহাই হল খোদা মিলন,
নিজেকে ইহাতে হারিয়ে ফেল, কেবল ইহাই কামালিয়ত (পূর্ণতা)।

কবিতা

হে প্রত্যুষের পাখি! পতঙ্গের সাথে ভালবাসা করতে শিখ, সে ইশকের পথে নিজেকে দগ্ধ করে দেয় (নিজেকে উৎসর্গ করে ফেলে) কিন্তু কোন উহ্ শব্দ পর্যন্ত তার থেকে বের হয় না।

এই দুনিয়াদাররা যারা নিজেদেরকে প্রকৃত প্রিয়তমের সন্ধানকারী বলে দাবি করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে অনবগত এবং তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ এই যে, তাঁর সত্তা সম্পর্কে তারা অবগত হয়েছেন কিন্তু তাঁর হাকিক্বত সম্পর্কে কখনও অবগত হননি।

চতুর্থ ফরতু : হে প্রিয় বন্ধুগণ! নিসবত সর্ম্পকে বর্ণনা প্রসঙ্গে

ত্বরিকতের শায়খগণের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) তরিকা সমূহের মূল উদ্দেশ্য হল নফ্স বা মানব সত্ত্বাতে এক স্থিতিশীল অবস্থা অর্জন করা যাকে সুফিয়ায়ে কেরামগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) নিসবত বলে থাকেন। এই জন্য যে, নিসবত হল আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক ও সংযোগকে বুঝায়। ইহাকে নূর (জ্যোতি) ও সাকিনা (প্রশান্তি) বলা হয়। আর নিসবত এর হাকিকত (মৌলিকত্ব) ও প্রকৃতি হল একটি অবস্থা বিশেষ যা নফ্সে নাতেকা (কথাবার্তা শক্তি সম্পন্ন মানব সত্তা) এ প্রবিষ্ট হয়ে যায়। ইহা ফেরেশতা গুণ বিশিষ্ট অথবা তৎউর্দ্ধ জবরুত জগতের পবিত্র প্রেরণা জনিত উপকারিতার অন্তর্ভূক্ত। জানা উচিত যে, যখন জমীনে বীজ বপন করা হয় এবং পানি ও বায়ুর উত্তম অংশ সমূহ উহাকে (বীজ) প্রত্যেক দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলে, তখন উক্ত বীজ যমীনে আল্লাহ তায়ালার গচ্ছিত শক্তি দ্বারা উত্তম অংশ সমূহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং রূপান্তর ঘটান। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার (রূপান্তর প্রক্রিয়া) মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের দৈহিক বর্ধনের দিকে মনোনিবেশ করে। সেই সময় পাতা ও শাখা গজিয়ে ধীরে ধীরে ফুল ফল বের হয় এবং শেষ পর্যায়ে দূর্বল ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আর যখন প্রত্যেক বীজের গঠন প্রক্রিয়া এবং প্রত্যেক বৃক্ষের বিন্যাস আলাদা দেখা যায়। তখন উক্ত শক্তি সমূহকে বহনকারী নফ্সকে (প্রাণ) সাব্যস্ত করার ব্যপারে আকল (বুদ্ধি) নিঃসহায় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যখন বীর্য ও ঋতুস্রাবের রক্ত গর্ভাশয়ে স্থির হয় এবং প্রজননকারী নফ্স (মানব সত্তা) উহার প্রচেষ্টা করে, তখন বায়বীয় আত্মার মূল খনি অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্ক প্রকাশিত হয়ে যায়। সেই সময় সুঘ্রানযুক্ত কোমল হাওয়া ও সূক্ষ্ম উপাদান সম্বলিত বায়বীয় আত্মা কয়েক প্রকার পরিপাকের পর সৃষ্টি হয়।

এই রূহ (আত্মা); যা খাদ্য, বর্ধনকারী ও উপলব্ধিমূলক শক্তিকে বহনকারী, তা উহাতে ফুঁকে দেওয়া হয়। ইহা (আত্মা) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় এবং উক্ত অংশ সমূহের আকৃতিও পরিবর্তিত হয়। আর অপর আকৃতি প্রকাশ্যে ধারণ করে। উক্ত প্রক্রিয়া সমূহের বিধিব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। যে গুলো রূহ (আত্মা) এর দিকে সম্বন্ধ করা হয় এবং উহাকে নফ্সে হাইওয়ানী বলা হয়। ইহার উপর অনুমান করে দ্বিতীয় একটি নফস রয়েছে যেটি মানবিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজন মনে করে এবং মানবের পূর্ণ মতামত ও পাঁচ লতিফা[১] সমূহের বৈশিষ্ট্য বিস্তারীতভাবে তার থেকে প্রকাশিত

[১] পাঁচ লতিফা সমূহ হল-বাতাস, পানি, আগুন, মাটি ও নফ্স।

হয়। আর ইহাকে নফ্সে নাতেকা বলা হয়। আর বিশেষভাবে নফ্সে নাতেকা এবং ব্যাপকভাবে প্রত্যেক নফ্স নফ্সে কুল্লিয়া (নফ্স) সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ শব্দ এবং উহার তরঙ্গসমূহ থেকে একটি তরঙ্গ। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুক্ষ্ম অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যে একটি নফ্স রয়েছে যেটি পৃথিবী পরিচালনাকারী; যা আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত সমস্ত প্রভাব বিস্তার ও কার্যাদি সংঘটিত হচ্ছে সবকিছু ইহার প্রভাব সাপেক্ষে, উহাকে নফ্সে কুল্লিয়া (Universel *nafs*) বলা হয়। আর বিশেষ কর্মসমূহের উৎস হল তবিয়তে কুল্লিয়া[১] (পূর্ণ প্রকৃতি)। আর ঐ ব্যবস্থাপনা যেটি উক্ত নফ্সে কুল্লিয়া (পূর্ণ সত্তা) এর চাহিদার অন্তর্ভুক্ত উহাকে মাসলাহাতে কুল্লিয়া (পূর্ণ উপযোগীতা) বলা হয়। নফ্সে কুল্লিয়া কামনা করে নফসে জুযইয়্যা (আংশিক সত্তা) সমূহের মাসলাহাতকে[২]। আর নফ্সে জুযইয়্যার অন্তর্ভুক্ত হল গ্রহ-নক্ষত্র, প্রকৃতি, বস্তুর উপাদান সমূহ (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস), উদ্ভিদ ও প্রাণি সমূহ। এই নফ্সে জুযইয়্যাগুলো মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রূহের মত রূপকভাবে শক্তিসমুহকে বহনকারী এবং সবগুলো একটি নফ্সের মধ্যে সন্নিবেশিত। আর ইহাকে নফ্সে মুদাব্বির বলে; যেটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। আর প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে স্বীয় পর্যায় ও ভূমিকায় ঐ নফ্সই নিয়োজিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-পানি বাষ্প হয়ে যায় এবং বাতাস পানি হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে উভয় অবস্থায় নফ্সে কুল্লিয়া বাকি থাকে। কেননা একটি বিশেষ রীতি অনুযায়ী উপযুক্ত আকৃতিতে ইহার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর নফ্সে নাতেকার ধ্বংস ও ক্ষয়ের কারণে রূহানী অস্তিত্বের ফানা নফ্সে কুল্লিয়ার মধ্যে অর্জিত হয়।

এখন জান যে, যখন বান্দা ইবাদতের অজিফা সমূহ, উপাসনা, পবিত্রতা ও খোদা স্মরণে ধারাবহিকতা রক্ষা করেন, তখন তার ফেরেশতা গুণ বিশিষ্ট একটি গুণ অর্জিত হয়। যার স্থিতিশীলতা 'নফ্সে নাতেকা' বা কথাবার্তা শক্তি

---

[১] 'তবিয়তে কুল্লিয়া' (পূর্ণ প্রকৃতি) দ্বারা বস্তুসমূহের সামগ্রিক প্রকৃতিকে বুঝায়। প্রতিটি বস্তুর তবিয়তকে (প্রকৃতি) তবিয়তে জুযইয়্যা (আংশিক প্রকৃতি) বলা হয়। তবিয়তে জুযইয়্যা 'তবিয়তে কুল্লিয়া' (পূর্ণ প্রকৃতি) এর অংশ বিশেষ। যেরূপ সংখ্য সমূহের ধারাবাহিকতা ১ থেকে অসংখ্য সংখ্যার দিকে ধারাবাহিকভাবে চলমান। আর সব সংখ্যাগুলোর অসংখ্য চলমান ধারাবাহিকতা ১ সংখ্যার মধ্যে উহ্যভাবে বিদ্যমান, প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান নয়। অনুরূপভাবে তবিয়তে কুল্লিয়ার (পূর্ণ প্রকৃতি) মধ্যে উহার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহ, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণিসমূহের একটি ক্রমধারার প্রকৃতি উহ্যভাবে বিদ্যমান [সূত্রঃ দেহলভী ১৩, অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]।

[২] ফিক্হ শাস্ত্রের ভাষ্য মতে ঐ গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহকে মাসলাহাত (উপযোগীতা) বলা হয়, যেগুলো দ্বীন, জান-মাল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানব বংশধারা সংরক্ষণের জন্য জিম্মাদার। অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু সমূহে কল্যাণ বেশি এবং অকল্যাণ কম। মাসলাহাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল শরয়ী উদ্দেশ্যাবলীকে সংরক্ষণ এবং মানবজাতিকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা। [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]।

সম্পন্ন সত্তাতে হয়ে যায়। তখন তার মধ্যে আলমে জাবরুত (ফেরেশতা জগত) এর প্রভাবশালী ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ হয়। এই উভয় বিষয় নিসবতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা প্রত্যেক বস্তুর অধীনে তাদের মধ্যে অনেক শ্রেণি সমূহ নিসবতের অন্তর্ভূক্ত।

এ জন্য উপরে উল্লেখিত প্রকার সমূহ সহ একটি হল মহব্বত (ভালবাসা) ও ইশক (বাসনাশূণ্য প্রেম) এর নিসবত। কেননা পবিত্র ভালবাসার বৈশিষ্ট্য মানবের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অপরটি হল নফ্সে শেকানী এবং নফ্সের কাম্য বস্তু হতে বিরত থাকার নিসবত বা সম্বন্ধ; যাকে নিসবতে আহলে বায়াতও বলা হয়। আবার সেগুলোর নিসবতে মোশাহেদা বা মোশাহেদার সম্বন্ধ রয়েছে। ইহা পবিত্র সত্ত্বার দিকে মনোনিবেশ করে শক্তি সঞ্চয় করাকে বলে। যার সারমর্ম হল এই যে, খাঁটি মহব্বতের সম্পর্ক অনুযায়ী এবং নফ্সে শেকানী ইত্যাদির স্মরণে তারতম্য অনুযায়ী আল্লাহ্র দরবারে সার্বক্ষনিক উপস্থিতির রঙ্গ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আবার নফ্সে ইনসানী (মানব সত্তা) এর মধ্যে উক্ত বিশেষ রঙ্গের শক্তি প্রাবল্য থাকে অর্থাৎ শক্তিশালী গুনমান প্রতিষ্টিত হয়ে যায়। আর এই সুদৃঢ় শক্তির নাম নিসবত বা সম্বন্ধ। আর নিসবত বা সম্বন্ধসমূহ সীমাহীন। আর গুপ্ত বিষয়দির ধারক ব্যক্তি প্রত্যেক নিসবতকে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারেন। কাদেরিয়া, চিশ্তীয়া, নকশবন্দীয়া ইত্যাদি তরিকার শুগল (কাজ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল উক্ত নিসবত অর্জন করা। আর ইহা ধারনা করো না যে, উল্লেখিত নিসবত সমূহ তরিকা সমূহের উল্লেখিত শুগল (কর্মকাণ্ড) ব্যতীত অর্জন হবে না। বরং সত্য হল এই যে, তরিকা সমূহের এই শুগল (কর্মকাণ্ড)ও নিসবত হাসিলের কতেক পদ্বতি সমূহের মধ্যে একটি পদ্ধতি। তরিকাসমূহে কোন প্রকার সীমাবদ্ধ করণের উদ্দেশ্য নেই। সাহাবা ও তাবেয়ীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্যান্য পন্থায় এই নিসবত হাসিল করতেন। নিসবত হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে নামাজ ও তাসবীহ আদায়কালীন সময়ে নির্জনে যথাযথ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন, পবিত্রতা অর্জন, মৃত্যুকে স্মরণ; যেটি সুখ সম্ভোগ থেকে দূরে রাখে এবং সেগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা। সার্বক্ষনিক কুরআন তেলোয়াত করা এবং কুরাআনের মর্মার্থসমূহ গভীরভাবে অনুধাবন করা, উপদেশ প্রদানকারী কথা শুনার মাধ্যমে এবং ঐ সমস্ত হাদিস সমূহ চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে যেগুলো দ্বারা অন্তর নরম হয়।

সার কথা হল এই যে, সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উল্লেখিত নিসবত সমূহের উপর দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলতেন। তখন তাঁদের দৃঢ় ঈমানী শক্তি এবং নফ্সের প্রকৃতি অর্জিত হয়ে

যেত। আর তাঁরা উহা বাকী জীবনে তা পালন করে চলতেন। তরিকতের শায়খদের তরিকত পন্থাতে ইহা (নিসবত) রাসূল (দঃ) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও রং ভিন্ন এবং নিসবত হাসিলের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। মওলানা খরম আলী বলওয়ারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হযরত হাকিমে উম্মত মওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছাহেব মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হতে চুড়ান্ত কথা উদ্ধৃতি করেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনদের নিসবত হল নিসবতে এহসানিয়া (মঙ্গলজনক কর্ম)। আর এই নিসবত পবিত্রতা ও নিসবতে সকিনা (অন্তরের প্রশান্তি জনিত নিসবত) দ্বারা গঠিত সাথে রয়েছে ন্যায়-নিষ্ঠা, পরহেযগারী ও ক্ষমার সংমিশ্রণ। তাই, তাঁর কথার মূল মর্মার্থ হল ইহাই। এখন তোমার জন্য উপযোগী যে, উক্ত হযরতগণের অবস্থাদি ও কথাবার্তা সমূহকে এই ব্যাপারে যা আমি বর্ণনা করেছি- অনুমান করে নাও। যেহেতু, তাঁদের কাহিনী ও ঘটনা সমূহ এই ব্যাপারে স্বাক্ষ্য ।

হযরত মওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'ফুয়ুজুল হারমাইন' কিতাবে লিখেন যে, আহলে বায়াতের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ইমামগণের রূহ মানস চক্ষে দেখছি যে, তাঁরা একে অপরের আদল দৃষ্টিতার সাথে ধারণ করে রেখেছেন। আর তাঁদের সিলসিলা (পরস্পর মিলন) আলমে আরওয়াহে (আত্মার জগত) 'খতিরাতুল কুদস' (পবিত্র প্রেরণাস্থল) এর সাথে বিস্ময়কর পদ্বতিতে এবং বিরল স্থিরতায় মিলিত হয়ে আছেন। আর আমি দেখেছি যে, তথায় তাঁদের কথাবার্তা বাইরের তুলনায় আরও অধিক প্রচলিত রয়েছে। আবার উক্ত মওলানা 'হামআত' গ্রন্থে লিখেন যে, তাসাউফের রাস্তায় সামগ্রীক পরিবর্তন চারটি। হযরত (দঃ) ও সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে এবং পরবতী কয়েক যুগ পর্যন্ত কামেল ব্যক্তিদের অধিকাংশ তাওয়াজ্জুহ (মনোনিবেশ) প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাহ্যিক শরীয়তের দিকে ছিল এবং আপরাপর স্তরগুলো ইহাতে লুপ্ত ছিল। তাঁদের এহসান, রোজা, নামাজ, যিকর, তেলোয়াত, হজ্ব, সদকা ও জিহাদ ছিল। তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ গুপ্ত রহস্যাদির ব্যাপারে চিন্তা করতেন না। হাঁ, সত্যানুসন্ধানীগণ নামাজ ও যিকিরের মধ্যে মোনাজাতের স্বাদ পেতেন এবং কুরআন তেলোয়াতে উপদেশ গ্রহণকারী হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ মত্ততা, পরমানন্দ প্রকাশ ও কাপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি করতেন না। আর শরীয়ত পরিপন্থী কথাবার্তা বলতেন না। তজল্লী (খোদার জ্যোতি রশ্মি) ও গুপ্ত রহস্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে খবর রাখতেন না। তাঁরা বেহেশতের আকাংখা ও দোযখের ভয়ে ইবাদত বন্দেগী করতেন। আর কশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি),

আলৌকিক ঘটনা, উম্মত্ততা ও ভাব বিভোরতা তাঁদের থেকে খুব কম প্রকাশ হত।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সৈয়দুত্তায়েফা হযরত জোনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর যুগে অন্য একটি রূপ উদ্ভাসিত হল। সাধারণ ব্যপারটি স্থবির হয়ে গেল এবং খাস (বিশেষ) বিষয়টি ব্যাপক অধ্যবসায়, কঠোর সাধনা, ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা ও সার্বক্ষনিক কার্যক্রম দ্বারা গুনমান অর্জন করে। আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্তঃকরণের সম্পর্কের নিসবত সৃষ্টি করলেন। সেই দিকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ মনোনিবেশ রেখেছেন। আর উহার স্থিরতার দিকে মুখোমুখি হলেন। সময়কাল ব্যাপী অত্যন্ত গোপনে মোরাকাবায় রত থাকতেন। আর খোদার তজ্জলীর (জ্যোতি-রশ্মি) অবস্থাদি, গুপ্তরহস্যাদি, ভালবাসা ও ভয় অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছেন। আর স্বীয় অবস্থাদি কথা ও ইঙ্গিত দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। আর উক্ত স্তরের সবচেয়ে বাস্তব বিষয় উহা ছিল যে, ব্যাখ্যা করতেন না। বরং ঐ অবস্থা ব্যাখ্যা করতেন যা নিজের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং ছেমার দিকে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর উম্মত্ততা, কাপড় ছিড়ে ফেলা ও নৃত্য তাঁদের মধ্যে তৈরি হল। কথাবার্তায় শিষ্টতা ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁদের থেকে প্রকাশ হল। তাঁদের অধিকাংশ জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গল ও পাহাড়ে যেতে থাকেন। আর পানাহার ত্যাগ করে শুধুমাত্র পাতা, গাছ গাছালি ও ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। নফ্‌স ও শয়তানের প্ররোচনা এবং পার্থিব গোলযোগ হতে সতর্ক হয়ে স্বীয় নফ্‌সের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের আন্তরিক বিষয় ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বেহেশতের লোভ ও দোযখের ভয়ে করতেন না। বরং খোদার নিছক ভালবাসায় উপাসনা করতেন। তাওয়াজ্জুহে খাস (বিশেষ মনোনিবেশ) বলা হয় নফ্‌সের সমষ্টিগত বিষয় যা হাকিকত সমূহের হাকিকতের (আল্লাহ) দিকে হয়ে থাকে। যার কারণে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে থাকতেন এবং তাঁদের পদক্ষেপ চলমান ঘটনায় বিজয় লাভ করত। সেরূপ তাঁরা লক্ষ্য বস্তু অর্জনে এগিয়ে যেতেন। সর্বদা সেই ব্যপারে বলতে থাকতেন এবং সেই দিকে ইশারা করতেন। আর তাতে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি করত যে, ইবাদত-বন্দেগীর আলোক রশ্মি প্রাবল্য হত। আর এই বিষয়টি চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নেয় এমন বিদ্যুতের মত ও সর্বদা অধিকতর উজ্জ্বল হত।

কবিতা

খেয়ালী রাত অন্তরে ঠাট্টাচ্ছলে আসল এবং চলে গেল,
মুহূর্তগুলো শবে কদরের মত স্পন্দন জাগিয়ে চলে গেল।

অতঃপর তরিকার সুলতান শায়খ আবু সাঈদ ইবনে শায়খ আবিল খায়র ও শায়খ আবুল হাসান খারকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর যুগে দ্বিতীয় আরেকটি রূপ দেখা গেল। অতঃপর সাধারণ লোকেরা নিজ নিজ আমল সমূহের উপর স্থির থেকে গেলেন এবং খাস ব্যক্তি সমূহের মাঝে এমন জজ্‌বা (খোদার আকর্ষণ) সৃষ্টি হল যে, যার কারণে তাঁরা (খাস ব্যক্তিগণ) বিশেষ তাওয়াজ্জুহ এর দিকে পথ নির্দেশ পেলেন এবং খেরকা (পোশাক), বিনয় ও স্রষ্টার উপস্থিতি দ্বারা সুশোভিত হলেন।

এই সমস্ত হযরতগণ অযীফা সমূহের দিকে খুব একটা আগ্রহী হননি এবং মোজাহেদা, রিয়াজত, দুনিয়া ও নফ্‌সের প্ররোচনা সম্পর্কে চেনার ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ উক্ত তাওয়াজ্জুহ এর পূর্ণতার দিকে ছিল। সেই সময় তৌহিদে শুহুদী ও তৌহিদে ওজুদি[১] সম্পর্কে পার্থক্যকারী ছিলেন না। বরং তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নফ্‌সের অন্তর্নিহিত গুনমান অর্জন। কোন বস্তুর মৌলিক গুণাবলী যেমন আছে তার হাকিকতের (সত্য অনুসন্ধান) বিশ্লেষণ ছিল না। অতএব, ইহার পরবর্তীকালে হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) যুগে তাঁদের অনুধাবন শক্তি প্রশস্ত হল এবং ইন্দ্রিয় প্রসূত বিবেক থেকে সরে এসে বস্তুর মৌলিক গুনাবলীর সত্য অনুসন্ধানে কোমর বাঁধলেন। আর তারা তানাজ্জুলাতে ওয়াজিবকে বুঝতে পারলেন। প্রকাশকারী আর কে এবং প্রকাশ কি? ইহার উপর অনুমান কর। মোটকথা, এই সমস্ত সম্প্রদায় সমূহ মূলত এক এবং রং-এ ভিন্ন। উক্ত চারটি সম্প্রদায়ের পদক্ষেপ খোদার সর্বোচ্চ পরিষদে সঠিক। অতএব, ওয়াজিব (আবশ্যক) যে, প্রত্যেক স্তরের কথাবার্তাকে তাঁদের রুচি অনুযায়ী পরিচালিত করবে। আর একজনের রুচিকে অপরজনের রুচির উপর প্রাধান্য দেবে না। কতেক মুর্খরা বলে যে, কাদেরিয়া, চিশ্‌তীয়া ও নকশবন্দীয়ার খাস শুগল (সাধন কর্ম) সমূহ সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে ছিল না। তাই বেদাতে সাইয়্যায়াহ (খারাপ বেদাত) হয়েছে। ইহার সার উত্তর হল এই যে, যেই কাজের জন্য আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) তরিকতে

[১] 'ওয়াহদাতুল অজুদ' অর্থ "অস্তিত্বের ঐক্য" বা "সত্তার ঐক্য" বা "অদ্বৈতবাদ"। অজুদ বা "অস্তিত্ব, উপস্থিতি" বলতে এখানে আল্লাহকে বোঝায়। অন্যদিকে, ওয়াহদাতুস শুহুদ অর্থ "সাপেক্ষবাদ" বা "সাক্ষীর একেশ্বরবাদ", যা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক। সুফি যখন বলেন, 'আমি আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখিনা'। তাঁর এই কথাটি তৌহিদে শুহুদী বা ওয়াহদাতুল শুহুদকে নির্দেশ করে। যখন তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে যা কিছু দেখি তন্মধ্যে আল্লাহকে দেখি'। তার এই কথা তৌহিদে ওজুদী বা ওয়াহদাতুল অজুদকে নির্দেশ করে। ওয়াহদাতুস শুহুদকে ফানা অবস্থা এবং ওয়াহদাতুল ওয়াজুদকে বাকা অবস্থা বলা হয়। উভয়টি পরস্পর পরিপূরক। একটি অপরটি থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না। [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]।

এই শুগল সমূহ (সাধনকর্ম) নির্ধারিত করেছেন, উক্ত সাধন কর্মসমূহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক চলে আসতেছে। যদিও উহার অর্জনের পদ্ধতি সমূহ ভিন্ন। তাই বাস্তবিকপক্ষে, তরিকতের আউলিয়াগণ শরীয়তের মুজতাহিদগণের মত হলেন। শরীয়তের মুজতাহিদগণ বাহ্যিক শরীয়তের বিধান নির্গত করাকে মৌলিক বিষয় মনে করেছেন। আর তরিকতের আউলিয়াগণ শরীয়তের আভ্যন্তরীন বিষয় অর্জনে; যাকে তরিকত বলা হয় বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন। তাই, এখানে বেদাতে সাইয়্যায়াহ (খারপ বেদাত) এর ধারণা সরাসরি ভুল। হাঁ, ইহা অবশ্যই যে, হযরত সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের পরিচ্ছন্ন স্বভাবের কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নিসবত অর্জনের ক্ষেত্রে এই সাধন কর্ম সমূহের প্রয়োজন ছিল না। শুধুমাত্র একটি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে পূর্ণ কামালিয়ত তাঁদের হাসিল হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা হাসিল হয় না।

কিন্তু পরবর্তী সূফিগণ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর যুগের পর অবশ্যই উল্লেখিত শুগল সমূহের (সাধন কর্ম) প্রয়োজন হয়েছে। যেমন সাহাবায়ে কেরামদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নিকট কুরআন-হাদিস বুঝার জন্য নাহু ও ছরফ (আরবি ব্যাকরণ) এর নীতিমালা বুঝার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আহলে আজম (অনারব) ও বর্তমান আরবগণ উহার (আরবি ব্যাকরণ) মুখাপেক্ষী। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

অতএব, জানা প্রয়োজন যে, নিসবত (সম্বন্ধ) এর উপর অধ্যবসায় অবলম্বনকারীদের অবস্থা দিন দিন সুউচ্চ হয়। কখনও কখনও তো সালেক (খোদা পথচারী) উক্ত সুমহান অবস্থাকে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মনে করেন। আর জানিয়ে দেয় যে, উল্লেখিত অবস্থাসমূহ ইবাদত কবুল হওয়া এবং সুপ্ত প্রবৃত্তি ও অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার নিদর্শন বা কারণ। মোটকথা, সুউচ্চ অবস্থা সমূহে প্রেমাস্পদের সন্তোষ ও প্রেমাস্পদকে আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া হযরত সোলাইমান (আঃ) এঁর কাহিনীর অনুরূপ যার কাছে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের মর্মার্থের অবগতি আছে। আল্লাহ্‌র বাণী- 'অতঃপর সেগুলোর গোছ ও গর্দানগুলোর উপর হাত বুলাতে লাগল।"(সূরা ছোয়াদঃ ৩৩)। মোটকথা, (আশেকের উচিত) তাঁর (প্রেমাস্পদ) ভয় ও বাঞ্ছিত সন্তুষ্টি অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপ্ত করা এবং অশ্রু দ্বারা চোখ সিক্ত করা সাথে সাথে তাঁর (প্রেমাস্পদ) সত্য স্বপ্ন, সৎ অন্তর্দৃষ্টি এবং ঐ স্মৃতি যা বাস্তব সম্মত তা ধারণ করা। হাদিসের মধ্যে এসেছে- 'তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা সে আল্লাহ্‌র নুর দ্বারা দেখে'। আর তাঁদের দুআ

(প্রার্থনা) কবুল হয় এবং স্বীয় উদ্যমের প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে যা চায় তা প্রকাশিত হয়। সেই দিকে নিম্নোক্ত হাদিসটি ইঙ্গিতবহ-'কতেক লোক ধুলোবালি মিশ্রিত চুল বিশিষ্ট পেরেশান পুরাতন জীর্ণশীর্ণ কাপড় পরিধানকারী, যাঁদের কেউ খেয়ালে আনেন না। যদি তাঁরা আল্লাহ্‌র খাতিরে শপথ করে বসেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের শপথ সত্যে পরিণত করেন'। আল্লাহ্‌র কাছে কতেকের এমন কাম্যতা রয়েছে যে, যেরূপ সে বলেছে, তিনি (আল্লাহ) সেরূপ করে দেন। অতএব, নিসবত হাসিল হওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপ হল উরুজ ও তরক্কি (আধ্যাত্মিক উন্নতি)। ইহা হল ফানা ফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করা। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে দান করেন। অনুরূপভাবে, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' গ্রন্থে হযরত মওলানা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

পঞ্চম ফরতু : চৌদ্দটি সুফী সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে

চৌদ্দটি সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে বিষয়টি প্রসিদ্ধ তা এইরূপ- যখন হযরত রাসূল (দঃ) এঁর মা'রেফতের সম্পদ ও নিয়ামত শাহ মর্দান (পুরুষদের বাদশাহ) আলী মুর্তজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর উপর অর্পিত হল, তিনি (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) পরিপূর্ণ শিক্ষা দীক্ষার পর এই নিয়ামত হযরত খাজা হাসান বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কে অর্পন করেন। পরবর্তীতে তিনি [হাসান বসরী রহমতুল্লাহে আলাইহি] হযরত খাজা হাবীবে আজমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কে এই অপ্রত্যাশিত নিয়ামতটি দ্বারা সুশোভিত করেন। তাঁর (হাবীবে আজমী রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকে হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর নিকট এই নিয়ামত পৌঁছে। এই স্থানে এসে সূফী সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। হযরত হাবীব আজমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে নয়টি সূফী সমপ্রদায়ের নিসবত (সম্বন্ধ) করা হয়ে থাকে। ইহার বিস্তারীত হল- হাবীবীয়া, তাইফুরিয়া, করখিয়া, সক্বতিয়া, জোনাইদিয়া, গারজুনিয়া, তুসিয়া, ফেরদৌসিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া। আর হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে পাঁচটি সূফী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ করা হয়। ইহার বিস্তারিত হল- যায়দীয়া, আয়াদিয়া, আদহামীয়া, হোবাইরিয়া ও চিশ্‌তীয়া। এইগুলোর মধ্যে যায়দীয়া; যেটি হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত সবাই [এই তরিকার শায়খগণ] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বংশোদ্ভুত। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং অত্যন্ত জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা তাঁদের নিসবত (সম্বন্ধ) ও উদ্দেশ্যকে হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদের সাথে ঠিক করেন। স্বীয় বাপ দাদাদের সম্বন্ধ (নিসবত) ও তাদের শহর ও ঘর বাড়ির কথা ভুলে গেলেন। হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তাঁদের খেলাফত দ্বারা সম্মানিত করেন। তাঁদের সমুজ্জ্বল তরিকা হল এই যে, তাঁরা কুরআন মজিদ হিফজ করতেন এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতেন। আর বন-জঙ্গলে গিয়ে রিয়াজত মোজাহাদা ও নির্জনতায় মগ্ন থাকতেন। আর সর্বদা রোজা রাখতেন। তৃতীয় বা চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে একবার জঙ্গলের ফল বা ঘাস দ্বারা ইফতার করতেন। কোন প্রাণীকে হত্যা করতেন না। এমনকি পিপড়া ও বিচ্ছুকে কষ্ট দিতেন না। আর রাত দিন আল্লাহ্‌র যিকিরে রত থাকতেন। কখনো শহর ও লোকালয়ে (বস্তি) আসতেন না এবং থাকার ঘর বানাতেন না।

আর দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের ব্যাপারে ঘৃণা ও আতংক পোষণ করতেন। কেউ যদি হাদিয়া তোহফা আনতেন গ্রহণ করতেন এবং ফকিরদের দিতেন। পুরু তালিযুক্ত ছেঁড়া পুরাতন কাপড় পরিধান করতেন এবং কেউ কেউ বৃক্ষের পাতাকে সেলাই করে পরিধান করতেন এবং তাঁরা অত্যন্ত সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কেউ যদি তাঁদেরকে বন জঙ্গল থেকে ধরে এনে দাসে পরিণত করত, তখন সেবা করতেন। কেউ বিক্রয় করে দিলেও তারপরও কিছু বলতেন না। এই সমস্ত লোক হাফেজ ও আলেম ব্যতিত কাউকে মুরিদ করতেন না। আর স্বীয় মুরিদদেরকে কল্যাণ (সেলাহ), মোজাহেদা (প্রচেষ্টা) ও রিয়াজতে (কৃচ্ছতা সাধন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ) মগ্ন করাতেন এবং পরিবার-পরিজন ও দুনিয়া ত্যাগী করে দিতেন।

আয়াজিয়াঁ শায়খ ফজল বিন আয়াজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধ। তাঁর তরিকা হল এই যে, সর্বদা একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করতেন এবং বিবাহ-শাদী ও সংসার করতেন না। সর্বদা নিজেকে কষ্ট ও পরিশ্রমের দিকে নিয়োজিত করাতেন। পার্থিব কাপড় পরিধান করতেন না। বরং ফেলে দেওয়া ছেঁড়া কাপড় ধৌত করে উহা দ্বারা নামাজ পড়তেন। আর করো কাছে কিছু চাইতেন না। কারো কাছে কোন কিছু চাওয়া ব্যতিত কিছু দিলে তা খেতেন নতুবা ক্ষুধার্ত থাকতেন। সারারাত জাগ্রত থাকতেন, যখন সকালের আলো ফুটত তখন দৌঁড়তেন এবং অধিকাংশ সময় খালি পায়ে থাকতেন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতের মেহমানদের সাথে ইফতার করতেন। লোকজনের সাথে মেলামেশা করতেন না। যখন কেউ তাঁদের ছোহবত (সাহচর্য) গ্রহণ করতে চাইতেন প্রথমে তাঁদের মত তাদেরকে নিঃসঙ্গ বানাতেন। যা কিছু তাদের মালিকানা ও হাতে থাকত সবকিছু দরিদ্রদেরকে দান করাতেন। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে সোপর্দ করাতেন। আল্লাহ ব্যতিত সবকিছু, রাগ ও ঘৃণা থেকে তাদের অন্তরকে পরিস্কার করাতেন। তখন স্বীয় মুরীদ হিসেবে গ্রহন করতেন।

আদহামিয়াঁ হযরত সুলতান ইব্রাহীম বিন আদহম (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল এই যে, একাকী থাকতেন। মোটা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। সফর ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় যিকরে জলি (উচ্চ স্বরে যিকর) করতেন। কারো কাছে কোন কিছুর আকাংখা করতেন না। কারো কাছে কোন কিছু চাওয়া ব্যতিত কিছু দিলে তা দরিদ্রদের দান করে দিতেন এবং অযাচিত মেহমান হয়ে তাদের (দরিদ্র) পাশে বসে তিনিও দুই চার গ্রাস খেয়ে নিতেন। কখনো দুনিয়াবাসীদের সাথে মেলামেশা করতেন

না। কেউ তাঁর মুরিদ হতে চাইলে সর্বপ্রথম দুনিয়াদারদের কর্মকাণ্ড থেকে তার অন্তরকে পবিত্র করতেন, তখন তাঁর মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত করতেন।

হোবাইরিয়াঁ হযরত হোবাইরা বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল এই যে, মিসকীনদের বসতীতে বসবাস করতেন এবং শহরে ঘর বাঁধতেন না। বন জঙ্গলে একাকী থাকতেন। বন জঙ্গলের ফলফলাদি অথবা উদ্ভিদ লবণ ছাড়া খেতেন। কারো ফতুহাত (উপহার) গ্রহণ করতেন না। তিন-চার দিন পর একবার জঙ্গলের ফল অথবা লবণ ছাড়া সবজি দ্বারা ইফতার করতেন। যাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এসে যায়।

চিশ্‌তীয়া হযরত খাজা আবু ইসহাক চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি হযরত শায়খ মুমশাদ দিনাওয়ারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। তাঁর তাওয়াজ্জুহ (সুনজর) ও সুদৃষ্টি দ্বারা খেরকা লাভের নেআ'মত দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর প্রতি হুকুম হল যে, তুমি চিশ্‌ত শহরের খাজা (প্রভু বা সর্দার)। তখন থেকে চিশ্‌ত শহরের খাজাগণ বিষয়টি প্রচলিত হয়। তারা পাঁচজন। প্রথমঃ হযরত খাজা আবু ইসহাক চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি), দ্বিতীয় জন হযরত খাজা আহমদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি), তৃতীয় জন হযরত খাজা মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি), চতুর্থ জন হযরত খাজা নাসীর উদ্দিন চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ও পঞ্চম জন হযরত খাজা মওদুদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)। এই পাঁচ জনকে চিশত শহরের খাজেগান বলা হয়। যে তাঁদের থেকে মুরিদ ও নিসবত (সম্বন্ধ) লাভ করেছেন তাকে কিয়ামত পর্যন্ত চিশ্‌তী বলা হয়। তাঁদের তরিকা এই যে, শহর অথবা বসতিতে বসবাস করতেন। লোকদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করতেন। খোদার উপর ভরসা করে জীবন যাপন করতেন। সর্বদা আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে দূরে সরে থাকতেন। সর্বদা রিয়াজত ও মোজাহেদায় রত থাকতেন। অধিকাংশ সময় উপবাস থাকতেন। দরিদ্র ও নিঃস্বদের সাথে ছোহবত বা সাহচর্য রাখতেন। দরিদ্রদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। ছেমা ও ছেমাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন। ধনীদেরকে দরিদ্রদের মধ্যে স্থান দিতেন না। গরীবদের হাতকে নিজে ধৌত করতেন এবং তাদের খাবার নিজেই পরিবেশন করতেন। চিশতের প্রত্যেক খাজেগান ইলমে মা'রেফতের অধিকারী ও কিমিয়া (পরশমনি) সদৃশ শুভ দৃষ্টি ছিল। তাঁরা যার দিকে শুভ দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন তাকে খোদার সাথে মিলিয়ে দিতেন। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের ভালবাসা থেকে তার অন্তর শীতল হয়ে যেত এবং নিয়ামতের অধিকারী ও কারামতের অধিকারী হয়ে যেতেন। যখন কেউ চাইতেন যে, তাঁদের মুরিদদের অন্তর্ভূক্ত

হবেন, প্রথমে স্বীয় অন্তরকে বিশুদ্ধ (তাযকিয়া) ও পরিশুদ্ধ করতেন এবং পরবর্তীতে মুরিদ হতেন। যাতে তাঁদের শুভ দৃষ্টির বরকতে আড়াল মুক্ত হয়ে যায় এবং প্রেমাস্পদের দর্শন দ্বারা মিলন প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

হাবীবীয়াঁ হযরত হাবীব আজমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আর ইহা হল-তাঁরা দুই ভাই হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সন্তানদের থেকে ছিলেন; যাঁরা আলেম, মুত্তাকী (খোদাভীরু) ও মানুষদের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধকামী ছিলেন। তাঁরা হযরত হাবীব আজমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। হযরত হাবীব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উভয়কে খেলাফত দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁদের বললেন, গারে হেরায় (হেরা গুহা); যেখানে রাসূল মাহবুব (দঃ) নবুওতের পূর্বে অধিকাংশ সময় গমন করতেন, সেখানে যেন তাঁরা গিয়ে অবস্থান করেন এবং মানুষদের সাথে যেন মেলামেশা না করেন। একাকীত্ব গ্রহণ করেন। এক সপ্তাহ পর একবার একটি অথবা তিনটি খেজুর দ্বারা ইফতার করেন। তাঁরা নির্দেশ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বার বছর পর্যন্ত সেখানে (হেরা গুহা) আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তাঁদের তরিকা হল- সভা সমাবেশে হাজির হতেন না। ফতুহাত (উপহার) গ্রহণ করতেন না। তিন বা চার বা পাঁচ সপ্তাহ পর জঙ্গলের ফল দ্বারা ইফতার করতেন। সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত থাকতেন। ছেঁড়া পুরাতন কাপড় দ্বারা লজ্জা স্থান ঢাকতেন। আর কোন সময় নতুন কাপড় মিলে গেলে ফকিরদেরকে দিয়ে দিতেন। বনের হরিণ তাঁদের সাথে কথা বলত এবং বলত, হে খোদার বন্ধুগণ! তোমরা আমাদেরকে যবেহ করে খাও। কিন্তু তাঁরা খেতেন না।

তাইফুরিয়া হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আবু ইয়াজিদ তাইফুর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হযরত হাবীব আজমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মুরীদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুজুর্গ ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি ১৫২ বছর জীবন পেয়ে ছিলেন। তিনি হযরত খাজা হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখেছিলেন। হযরত হাবীব আজমীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কাছে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করছিলেন। তাঁর মুরিদ ছিলেন চার জন। তিনি নিজেকে তাইফুরি বলতেন। তাঁর মুরিদগণ হলেন- শায়খ মাসউদ, শায়খ মাহমুদ, শায়খ আহমদ ও শায়খ ইব্রাহীম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ।

করখিয়া হযরত মা'রূফ করখি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল- পার্থিব সামগ্রী ত্যাগ করা, নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা গ্রহণ করা, সর্বদা রোজা রাখা, আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করা, ফকিরদের (অলি)

সাথে বন্ধুত্ব রাখা, নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ মনে করা, অপরকে নিজের থেকে উত্তম মনে করা এবং সর্বদা রিয়াজত ও মোজাহেদায় লিপ্ত থাকা।

সক্বতিয়াঁ হযরত শায়খ সির্‌রি সাক্বতি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল- সারা বছর রোজা রাখতেন, সারারাত ইবাদত করতেন এবং কারো কাছ থেকে ফতুহাত গ্রহণ করতেন না । তিন বা চার দিন পর নির্জনতা থেকে বাইরে আসতেন। সন্ধ্যার সময় দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতেন এবং তা দ্বারা ইফতার করতেন।

জোনাইদিয়া হযরত শায়খ সৈয়দুত্তায়িফা জোনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল- চারদিন পর ইফতার করতেন। আর এই ব্যক্তিগণ খেলাফত লাভ করার পর বার বছর পর্যন্ত পরিশ্রম ও পরিপূর্ণ মোজাহেদায় লিপ্ত থাকতেন। যদি ফতুহাত আসত প্রথমে ফকিরদের বন্টন করতেন, ইহার পর তিনিও খেতেন, কেউ তাঁর মজলিশ থেকে বঞ্চিত হতেন না।

গার্জুনিয়া হযরত সুলতান আবু ইসহাক ইমাম গারযুন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি বাদশাহী ত্যাগ করে শায়খ আবু আলী হোসাইন বিন মুহাম্মদ ফিরোজ আবাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মুরীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর তরিকা হল-সর্বদা নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং ইসমে আজম পাঠ করতেন।

তুসিয়া হযরত শায়খ আলাউদ্দিন তুসী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল-বাদ্যযন্ত্র সহকারে ছেমা শুনতেন এবং যিকরে জলি (উচ্চ স্বরে যিকির) করতেন। ফতুহাত হিসেবে যা কিছু আসত তা মুমিন, কাফির, ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করতেন।

ফেরদৌসিয়া হযরত শায়খ নজম উদ্দিন কুবরা ফেরদৌসী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আর ইহা হল এই যে, হযরত শায়খ নজম উদ্দিন কুবরা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এবং হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ তুসী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব রাখতেন। মুজাহেদা ও রেয়াজতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিকে পরিপূর্ণ ছিলেন। জঙ্গলের ফল বা যবের রুটি লবণ ছাড়া খেতেন। তাঁদের কিমিয়া সদৃশ বিশেষ সুদৃষ্টি যার উপর পড়ত সে আল্লাহ্‌র সাথে মিলন লাভ করত। উভয় বুজুর্গের প্রত্যেকে হযরত শায়খ জিয়া উদ্দিন আবুন নজিব আব্দুল কাদের সোহরাওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর পাশে আসলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আফসোস! আমার বয়স শেষ হয়ে এসেছে এবং আমার কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। মোজাহেদা ও রেয়াজতে মরে

গেলাম এবং অন্তরের বাঞ্চনা পূর্ণ হল না। এখন কি করা উচিত? এখন কি উপায় আছে? হযরত শায়খ জিয়াউদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন, আমিও ইহার ভুক্তভোগী। চলুন, আমরা কোন বুজুর্গের খেদমত গিয়ে মুরিদ হয়ে যাই। যাতে তাঁর বরকতে বাঞ্ছিত স্থলে পৌঁছে যাই। উভয় বুজুর্গ বললেন যে, পীরের বন্দেগী (সেবা) সহ যা কিছু বলা হয় সবটাই মঞ্জুর করলাম। হযরত শায়খ জিয়া উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, হযরত শায়খ ওজাহ উদ্দিন আবু হাফস (রহমতুল্লাহে আলাইহি); যিনি শায়খ ওমাবিয়া নামে সুপরিচিত, তিনি অনেক বড় বুজুর্গ। চলুন, আমরা তিনজন তাঁর মুরীদ হয়ে যাই। অতএব, উক্ত তিনজন বুজুর্গ হযরত শায়খ ওজাহ উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর খেদমতে গমন করেন এবং মুরীদ হয়ে যান। হযরত শায়খ ওজাহ উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হযরত শায়খ জিয়াউদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ও শায়খ আলাউদ্দিনকে (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মুরীদ করানোর পর খেলাফত দান করেন। তাঁদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা নিজ নিজ শহরে গিয়ে খোদার বান্দাদেরকে হেদায়তের পথের দিকে আহবান করতে থাক। উহার পর শায়খ নজম উদ্দিন কুবরার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হাত ধরে শায়খ জিয়া উদ্দিনকে (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সোপর্দ করলেন এবং বললেন, তাঁকে (নজমুদ্দিন কুবরা রহমতুল্লাহে আলাইহি) তুমি নিজের কাছে রাখবে। তোমার নাম তাঁর দ্বারা সমুচ্চ ও উজ্জ্বল হবে। শায়খ জিয়া উদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মুরীদ হওয়ার সাত মাস পর শায়খ নজমুদ্দিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কে খেলাফত দিয়ে বললেন, আপনি ফেরদৌস গ্রামের বুজুর্গ শায়খ। সেখান গিয়ে হেদায়ত করুন। সেই সময় থেকে ফেরদৌসী ব্যক্তি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

সোহরাওয়ার্দীয়া হযরত শায়খ জিয়া উদ্দিন আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর তরিকা হল- শায়খ জিয়া উদ্দিন মুরীদ হওয়ার আগে বার বছর পর্যন্ত স্বীয় নফ্সকে সপ্তম দিন পর পানি ও খাবার দিতেন এবং তিনটি মাত্র খেজুর খেতেন। সর্বদা খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। যখন মুরীদ হলেন এবং খেলাফত লাভ করলেন, তখন এক চিল্লে (চল্লিশ দিন) পর স্বীয় নফ্সকে পানি ও খাবার দিতেন এবং তিনটি খেজুর খেতেন। সর্বদা কিবলামুখী ও জাগ্রত থাকতেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও অধিক বিজ্ঞানময়।

হাকিমে উম্মতে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মওলানা শাহ অলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'হামআত' গ্রন্থে লিখেন যে, জানা উচিত- যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ) কে সর্বোত্তম ধর্ম

ইসলাম ধর্ম সহ এই অনুগৃহিত উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করলেন। খোদায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁর সুদৃঢ় ধর্মের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত হল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'নিশ্চয় আমি নিজেই উহার সংরক্ষণকারী।' (সূরা হজ্জ)। যাতে উক্ত খোদায়ী সাহায্যের মাধ্যমে তাঁর সুদৃঢ় দ্বীন (ধর্ম) সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। আর ইসলাম ধর্মের প্রচারের মাধ্যমে আরব ও অনারবদের নফ্সকে (মানবপ্রকৃতি) পরিমার্জন ও মানুষদের থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করার বিষয়টি ভালভাবে বাস্তবায়িত হয়। ইসলাম ধর্মের দুইটি দিক রয়েছে, একটি হল প্রকাশ্য ও অপরটি হল বাতেন (অপ্রকাশ্য)। সে জন্য খোদায়ী সাহায্য সহযোগিতা উক্ত ধর্মের সুরক্ষার ব্যাপারে দুইভাগে বিভক্ত। যখন হযরত খোদার পযগাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ট বন্ধু (আল্লাহ) এঁর সাথে সাক্ষাত লাভ করেন (ইন্তেকাল করেন)। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সংরক্ষণের খোদায়ী অঙ্গিকার তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরাধিকারীগনের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁদের মধ্যে একটি দল অনাদি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহায্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং বাহ্যিক শরীয়তের সংরক্ষণের জন্য কোমর বাঁধেন। আর ঐ দলটি হল ফকীহ, মুহাদ্দিস, গাজী ও ক্বারীদের দল। একটি দল অনাদি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খোদায়ী সাহায্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে সুদৃঢ় ধর্মের আভ্যন্তরীন (বাতেনী) দিক; যেটিকে ইহসান বলা হয়, তা পূণর্জীবিত করার জন্য প্রচেষ্টার কোমরকে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধলেন। এমনকি এই দলটি প্রত্যেক যুগে জগতবাসীদের উৎস স্থলে পরিণত হন। আর তাঁরা আনুগত্যের আলো হাসিল করার পদ্ধতি ও তাতে স্বাদ হাসিল হওয়ার পদ্ধতি, মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র ও বাতেনী অবস্থার সাথে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পদ্ধতি মানুষদের বাতলিয়ে দেন। মোটকথা, প্রত্যেক যুগে আউলিয়া কেরামদের মধ্যে একজন ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন। সুদৃঢ় বাতেনী ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য খোদায়ী সাহায্য তাঁর দিকে নিবেদিত হয় এবং উক্ত কাজকে তাঁর উসিলায় আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

পংক্তি

কস্তুরী ছড়ানো প্রকৃতপক্ষে তোমার জুলফির কাজ-কিন্তু আশেক ব্যক্তি সুবিধার খাতিরে ইহা বলে থাকে যে, কস্তুরী চীনা হরিণ থেকে আসে।

যখন উক্ত বিষয়টি আউলিয়া কেরামদের মধ্যে থেকে কোন অলির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর প্রকাশের আলামত (বৈশিষ্ট্য) ইহা ধরা হয় যে, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা মানুষদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর লোকেরা তাঁর দিকে ঝুঁকতে থাকেন। চতুর্দিকে মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রশংসাসূচক আলোচনার প্রসিদ্ধি ও চর্চা হতে থাকে। আর ধর্মের কাজ সমূহ থেকে যে কাজটি

সম্প্রদায়ের প্রকৃতির উপযোগী তাঁর অন্তরের মধ্যে তা ইলহাম হয়। তাঁর ছোহবত (সাহচর্য্য) ও কালাম (বাণী) এর মধ্যে জজ্ব (আকর্ষণ) ও প্রভাব গচ্ছিত থাকে। খোদা তালাশকারীদের সমাবেশ ও তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার কারণে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা উক্ত সম্প্রদায়ের দিকে ধাবিত হয়। ফলে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় উদ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হয়। আর শীঘ্র স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করে। আর যারা উক্ত সম্প্রদায়ের সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্খী হয়, তারা সর্বদা সফল ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। তাঁদের বিরোধীতাকারী ও অসহযোগিতাকারী সর্বদা প্রত্যাখাত ও লাঞ্চিত হয়। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তরে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি আগ্রহ ও সমীহ গিয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, লোকেরা উক্ত সম্প্রদায়ের স্থলে সমবেত হয়। যে পর্যন্ত উক্ত সাহায্য অপর লোকদের প্রতি গিয়ে পড়ে। মূলতঃ সম্প্রদায় অনেক রয়েছে, অনেক ছিল এবং অনেক গত হবে। কিন্তু ইহার সীমাবদ্ধতা কোনভাবে বোধগম্য নয়। তম্মধ্যে কিছু সম্প্রদায় নতুন, কিছু পূর্বের সম্প্রদায়ের পূণর্জীবনদানকারী ও সংস্কারক। কেউ কেউ বলেন- সমপ্রদায় মোট ১৪ টি, যেমন আগে উল্লেখিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন বারটি। কিন্তু তম্মধ্যে গ্রহণযোগ্য হল- জোনাইদিয়া, হাকিমিয়া, মোহাসেবীয়া, খফিফিয়া, নুরীয়া ও তাইফুরিয়া। অতঃপর জেনে রাখ, প্রকৃত অবস্থা এই যে, প্রত্যেক নিজ নিজ বুঝ ব্যবস্থা ও উপলব্ধি দ্বারা এক একটি মতামত দিয়েছেন। উক্ত সম্প্রদায়গুলোর পরবর্তীতে অন্যান্য সম্প্রদায়ও প্রকাশিত হয়। যেমন জামিয়া, কাদেরীয়া,আকবরীয়া,সোহরাওয়ার্দীয়া,কুবরাবীয়া,বসবীয়া,খাজেগান সম্প্রদায়, মুঈনীয়া সম্প্রদায়, নক্শবন্দীয়া, আহরারিয়া ও কুদ্দুসীয়া। কুদ্দুসীয়া সম্প্রদায় শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

গাউছিয়া সম্প্রদায় শায়খ মুহাম্মদ গাউছ গোয়ালিয়ারীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) দিকে সম্বন্ধযুক্ত। 'বাক্বিয়া' খাজা মুহাম্মদ বাক্বি বিল্লাহ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আহমদীয়া শায়খ আহমদ সেরহিন্দ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। 'আহসানিয়া' শায়খ আদম বানুরীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ওলবীয়া আমীর আবুল আলার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আরো অন্যান্য উত্তম সম্প্রদায় রয়েছে। তম্মধ্যে কতেকের প্রভাব অবশিষ্ট রয়েছে ও কতেকের নেই। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ ফরতু : শরীয়ত ও ত্বরিকত বর্ণনা প্রসঙ্গে

জ্ঞানী ও চাক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের নিকট একথা গোপন থাকে না যে, যা কিছু আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবার থেকে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌছিয়েছেন ইহাকে দীনে ইসলাম বলা হয়। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী- 'আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম।' (সূরা আলে ইমরান)। তাঁর পছন্দনীয় ও নির্ভরযোগ্য ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নাই। এই সুদৃঢ় ধর্মের হাকিক্বত ও মগজ হল মা'রিফত ও ঈমানে আইনি (মৌলিক ঈমান) এবং সুস্পষ্ট তাওহীদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালারই; যেটিকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে ইহা ব্যাখা করেছেন। সেই জন্য এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরগণ (আলাইহিমুস্সালাম) পবিত্র কালেমায়ে তাওহীদ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' কে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবার থেকে নিজ নিজ উম্মতদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। সমস্ত ধর্ম ও মিল্লাতের জন্য মৌলিক উদ্দেশ্য হল এই কালেমায়ে তাওহীদকে বুঝা। যদিও কতেক ধর্ম কালের ও অবস্থার ভিন্নতার কারণে তাওহীদের শাখা প্রশাখা সম্বলিত বিধানাবলীতে কতেক লোকের মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু মূল তাওহীদে; যেটি সমস্ত ধর্মের মুল উদ্দেশ্য, কারো কোন মতভেদ নাই। আর উক্ত তাওহীদকে বুঝানোর নিমিত্তে সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। বরং উক্ত তাওহীদের দীপ্তিময়তা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্ট জীবকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বের মধ্যে আনয়ন করেন।

সমস্ত ধর্ম ও মিল্লাত এবং সমস্ত আসমানী কিতাব বরং সমগ্র খোদায়ী জগত উক্ত কালেমায়ে তাওহীদেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। এই কালেমায়ে তাওহীদ আমানত স্বরূপ; যাকে আসমান, যমীন, আরশ, কুরসি এবং পাহাড়সমূহ এর ভার বহন করতে ভয় পেয়েছিল। পাতলা মাটির তৈরি আদম নির্ভয়ে ইহার ভার গ্রহণ করেছেন এবং আন্তরিক চোখে তা ধারণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী- 'নিশ্চয় সে ছিল নির্ভয় ও অজ্ঞ।' (সূরা আহযাবঃ ৭২)- এই বাণী দ্বারা সে সুশোভিত হল। হযরত হাফেজ বুলবুল সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

আসমান তৌহিদের সেই আমানতের ভার বহন করতে পারেনি,
আমার নামে ভাগ্যের লটারীতে মানবকে পাগল করে দিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই তাওহীদের মূল ঈমান এবং মূল উছুল দীনে ইসলাম এবং সমস্ত ধর্ম পূর্ণ ও ঠিক না হয়ে যাবে, তাহলে সমস্ত ভাল আমল এবং সমস্ত বন্দেগী ও ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। এই পবিত্র কালেমায়ে তাওহীদ; যেটি ইসলাম ধর্মের বিষয়। ইহার দু'টি দিক আছে। প্রথমটি যাহের (প্রকাশ্য) এবং দ্বিতীয়টি বাতেন (অপ্রকাশ্য)। ইহার উপর ভিত্তি করে ইসলাম দুই প্রকার। যথা: যাহের ইসলাম ও বাতেন ইসলাম। যাহের ইসলামকে ইসলামে যুসদানিও (শারীরিক ইসলাম) বলা হয়। শরীর হল অন্ধকার এবং কুপ্রবৃত্তির উৎপত্তি স্থল। যাহের ইসলাম (প্রকাশ্য ইসলাম) হল মৌখিক স্বীকৃতি ও ইসলামের আরকান সমূহ বাস্তবায়নকে বলা হয়। আর ইসলামে বাতেন (অপ্রকাশ্য ইসলাম)কে ইসলামে রূহানীও (আধ্যাত্মিক ইসলাম) বলা হয়। ইসলামে রূহানী একত্ববাদের নূর ও আল্লাহ্‌র মা'রেফত থেকে উৎসারিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব জাহানকে আলোকিত করে দেয় এবং প্রত্যেক প্রকারের কশ্‌ফও (অন্তর্দৃষ্টি) অর্জিত হয়। যাহেরি ইসলাম আল্লাহ নির্দেশ সমূহ বাস্তবায়নের অভিপ্রায় এবং তাঁর নিষেধ সমূহ থেকে বিরত থাকার অভিপ্রায়কে বুঝায় । যাহের ইসলাম বাতেন ইসলাম ব্যতিত মূল্যহীন এবং শুধুমাত্র যাহের ইসলাম দ্বারা খারাপ পরিণতির আশংকা থেকে যায়। তাই, তাফসীরে রুহুল বয়ানের লেখক সূরা ফাতেহার নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- 'বিচার দিবসের মালিক।' (সূরা ফাতেহা: ৪)।

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 'তাবিলাতে নজমীয়া' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ যাহের ইসলাম হাকিকি ইসলামের তাওহীদের সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। যদি প্রকৃত ইসলামের তাওহীদ কারো অর্জিত না হয়, যাহের ইসলাম কোন কাজে আসবে না। আর ইহাই 'খারাপ পরিণতি'র আশংকা এর মর্মার্থ। আবার এখানে মানুষের মধ্যে দুই ধরণের কামালাত (পূর্ণতা) সাব্যস্ত হয়। প্রথমটি হল- যাহেরি কামালাত (প্রকাশ্য পূর্ণতা)। আর সেটি বিশ্বদ্ধ আক্বিদা; যেটি কুরআন, হাদিস ও আহলে সুন্নাতের ইজমা অনুযায়ী হয় এবং ভাল কাজ, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব সমূহ প্রতিপালন ও হারাম, মাকরুহ, সন্দেহপূর্ণ ও বিদআত বর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। দ্বিতয়ীটি হল- বাতেনী কামালাত (অপ্রকাশ্য পূর্ণতা); ইহার প্রমাণ কয়েকটি দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। প্রথম দলীল হল-বোখারী ও মুসলীম শরীফে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদিন একজন অপরিচিত লোক হযরত রাসূল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দরবারে আগমন করে জিজ্ঞাসা করেন, ইসলাম কী? তিনি উত্তর দিলেন, 'কালেমায়ে শাহাদাত' বলা। নামাজ ও রোজা আদায় করা এবং যাকাত প্রদান

করা। আর যার সামর্থ থাকে হজ্ব করা। লোকটি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) আশ্চর্যান্বিত হলেন এই ভেবে যে, লোকটি স্বয়ং জিজ্ঞেস করছেন এবং স্বয়ং তা সত্যয়নও করছেন। অতঃপর লোকটি ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, ঈমান হল-আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রসুলগণ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দ উভয়টির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। লোকটি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি (লোকটি) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ইহসান কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ এবং তুমি যদি তাঁকে না দেখ তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি তোমাকে দেখতেছেন। অতঃপর তিনি (লোকটি) ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না। অতঃপর তিনি ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন এবং ক্বিয়ামতের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেলেন, তখন হযরত (দ.) ইরশাদ করলেন, তিনি ছিলেন জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম শিখানোর জন্য এসেছিলেন। উক্ত হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল যে, মানুষের মধ্যে আক্বিদা ও আমলগত বিষয় ছাড়া অন্য কামালাত (পূর্ণতা) এর বিষয়ও রয়েছে। যার নাম হল ইহসান। আর ইহাকে ফকিরদের (সূফি) পরিভাষায় বেলায়ত বলা হয়।

যখন সালেক (খোদা পথচারি) এর অন্তরে আল্লাহ্র প্রেম জাগ্রত হয়। যাকে সুলুকের পরিভাষায় ফানায়ে ক্বলব (অন্তঃকরণের লয়) বলা হয়। তখন বান্দা আল্লাহ ছাড়া সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মাহবুবে হাকিকি (প্রকৃত প্রেমাস্পদ) এর দর্শনে বিভোর ও লয় প্রাপ্ত হয়। সেই সময় যদিও দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। অতঃপর বান্দার তখন এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেন সে আল্লাহকে দেখতেছে। রাসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ। দ্বিতীয় দলিলটি হল- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মানুষের শরীরে এমন একটি মাংসের টুকরা আছে, যদি তা সুস্থ থাকে, তাহলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর যদি তা অসুস্থ হয়, তাহলে সারা শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। আর সেটি হল অন্তর; যাকে ক্বলব বলা হয়। যখন অন্তর খোদার প্রেমে ফানা (বিলীন) হয়ে যায়, তখন নফ্স তাঁর সংস্পর্শ দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে নফ্সে আম্মারার বৈশিষ্ট্য থেকে বিরত হয়ে যায়। আর যখন 'মানুষকে ভালবাসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই এবং তাদেরকে ঘৃণা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই' এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা বান্দা যখন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, তখন সমস্ত শরীর অনুগত ও শরীয়তের তাবেদার হয়ে যায়। এখানে যদি কেউ বলে, ক্বলবের সুস্থতা ইমান ও আমলের কারণে হয়ে থাকে, অন্য কারণে নয়। তখন বলা হবে যে, হাদিসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে- যে ক্বলবের সুস্থতা শরীরের সুস্থতার উপর নির্ভর করে। আর শরীরের সুস্থতা সৎকাজের কারণে হয়ে থাকে। অতঃপর সেক্ষেত্রে যদি ক্বলবের সুস্থতার কারণ শুধুমাত্র ঈমানের কারণে হয়ে থাকে বলা হয়, তাহলে শুধুমাত্র ইমান বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরের সুস্থতা ব্যতিতও হয়ে থাকে। যদি সার্বিক ঈমান ও আমলকে ক্বলবের সুস্থতার কারণ বলা হয়, অতঃপর সেক্ষেত্রে উহাকে শরীর সুস্থতার কারণ নির্ধারণ করা ঠিক নয়। তৃতীয় দলীল এই যে, সমস্ত মুমীনদের চেয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ইলম (জ্ঞান) ও আমলের ক্ষেত্রে উৎস হওয়ার ব্যপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যদি কেউ উহুদ পাহাড়ের সম পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তা সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কৃত এক বা অর্ধ ছা এর সমপারিমাণ হবে না। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামদের এই ফযিলত আধ্যাত্মিক পূর্ণতার কারণে হয়েছে। আর ইহা রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর ছোহবতের বরকতে তাঁদের অর্জিত হয়েছে। যদি উম্মতের আউলিয়া কেরামগণ এই সম্পদ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছেন। তাহলে ছোহবতের ঐ বরকতটিও আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) পেয়েছেন।

আর ইহা পরম্পরায় বাতেনীভাবে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও সাহাবীদের প্রাপ্ত ছোহবত এবং আউলিয়া কেরামগণের প্রাপ্ত ছোহবত এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। অতঃপর উহা থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, যাহের (প্রকাশ্য) পূর্ণতা ছাড়াও মানুষের মধ্যে ঐ বাতেনী পূর্ণতাও রয়েছে। যার কারণে তাঁদের স্তরের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। তাই হাদিসে কুদসীতে এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত কাছে আসে, আমি তার এক গজ কাছে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার এক গজ নিকটে আসে। আমি তার এক বাআ' (দুইগজ) নিকটবর্তী হয়ে যাই'। তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'মুমীন বান্দাহ যখন সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটে চলে আসে, তখন আমি তাকে ভালবাসি এবং স্বীয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। অতঃপর যখন

বন্ধু হিসেবে গ্রহন করি, আমি তার চক্ষু, কান, হাত ও পা হয়ে যাই' অর্থাৎ তার সমস্ত নড়াচড়া ও স্থিরতার কুদরতী অঙ্গ হয়ে যাই। চতুর্থ দলীল এই যে, সংখাগরিষ্ট দল; যাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ইলম ও আমলের কারণে নির্ভরযোগ্য এবং তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া আকল (বিবেক) সমর্থন করে না। প্রত্যেকে কলমের ভাষায় এবং মুখ কলমের মাধ্যমে এই সংবাদ প্রদান করে যে, মাশায়েখে কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ছোহবতের বরকতের ধারাবাহিকতা রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সম্পর্কযুক্ত। আমাদের অভ্যন্তরে আকাইদ ও ফিক্হ বিষয় ব্যতিত একটি অবস্থা এমন পাওয়া যায় যে, ঐ ছোহবতের আগে এই অবস্থা আমাদের অর্জিত ছিল না। আর যখন এই অবস্থা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল, তখন আল্লাহ্র প্রেম, তাঁর বন্ধুদের প্রেম এবং ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ, সৎকাজের প্রতি অনুপ্রেরণা ও সত্য বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেল। জেনে রাখ, হে প্রিয় বন্ধুগণ! রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ'। অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আবশ্যক, তা এই অর্থে ব্যাপক অর্থবোধক যে, হোক ইহা যাহেরী ইসলাম বা বাতেনী ইসলাম। চাই এই জ্ঞান বড় বড় কিতাব অধ্যায়ন করে অর্জিত হোক অথবা কোন খোদা পরিচিত জ্ঞানী অবগত করানোর মাধ্যমে অর্জিত হোক। পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ সবার উপর তা ফরজ। সেই বিষয়ে হযরত শায়খ সা'দী সিরাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

তোমার উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ,
অপরটি ওয়াজিব যদি তা দেশ সফর করেও হয়।
জ্ঞান অর্জন করতে মোমবাতির ন্যায় গলে যেতে হবে,
কেননা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহকে চেনা যায় না।

অতঃপর উক্ত কথার মর্মার্থ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত: ৫৬)। মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক, যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক, আলেম হোক বা মুর্খ হোক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার শর্তে ইসলামের খোদায়ী আমানত; যেটি আল্লাহকে জানা, খোদার পরিচিতি ও আল্লাহ্র তাওহীদ সংশ্লিষ্ট, তা প্রত্যেক বান্দাহর সামর্থ অনুযায়ী বহন করা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। আর কোন ব্যক্তির জন্য উক্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে; যা যাহের ইসলাম ও বাতেন ইসলামের বিধান পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং ওযর (আজুহাত)

পেশ করার কোন পথ নেই। আর এই বিধানাবলী পালনের ক্ষেত্রে সবাই সমান। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না'। আর এই ইসলামের বিধানাবলী পালনের কষ্ট সহ্য করা প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর ইহা মুকাল্লিফ (শরীয়তের বিধান পালনে কষ্ট সহ্যকারী) এর অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং মুকাল্লিফদের অবস্থা দুই রকম হয়ে থাকে। প্রথমটি প্রকাশ্য অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি বাতেন (অপ্রকাশ্য) অবস্থা। যাহের ইসলামের বিধানাবলী পালনের ক্ষেত্রে মুকাল্লিফদের বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিধান প্রযোজ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যায়েদের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা আছে এবং উক্ত টাকার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তখন এই অবস্থায় তার উপর যাকাত দেওয়া ফরজ। যাকাত না দিলে সে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী করতে হবে। আপরদিকে আমর এর কাছে কোন কিছু নাই। সে দিনের ভিখারী ও অপরের মুখাপেক্ষী। বরং সে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে।

তার উপর যাকাত গ্রহন করার বিধান প্রযোজ্য হয়। সেক্ষেত্রে সম্পদশালী যায়েদ যাকাত দেওয়ার পরিবর্তে যাকাত গ্রহন করে অথবা দরিদ্র আমর যাকাত গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণ নিয়ে যাকাত প্রদান করে। সেই অবস্থায় স্বীয় অবস্থার চাহিদার বিপরীত আমল করার কারণে যায়েদ ও আমর উভয়ে গোনাহগার ও আল্লাহ্‌র কাছে পাকড়াও হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যাহের ইসলামের বিধান হল যায়েদ এর যাকাত প্রদান করা এবং আমর এর যাকাত গ্রহণ করা। অর্থাৎ অবস্থার ভিন্নতার কারণে উভয়ের ক্ষেত্রে বিধান প্রয়োগও ভিন্ন হয়। তাসত্ত্বেও যায়েদ ও আমর মুকাল্লিফ হওয়ার কারণে যাহের ইসলামে মুকাল্লিফদের বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। আর অবস্থার ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক মুকাল্লিফের অবস্থাও ভিন্ন হয়। যেমন যাহের ইসলামের বিধানবালীর ক্ষেত্রে মুকাল্লিফদের বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। অনুরূপভাবে বাতেনী ইসলামে মুকাল্লিফদের বাতেনী অবস্থা বিবেচনা করা হয়। আর যেমন এই ক্ষেত্রে মুকাল্লিফদের বাহ্যিক অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিধানাবলী প্রয়োগে ভিন্নতা পাওয়া যায়। এখানেও আভ্যন্তরীন অবস্থা ভিন্নতার প্রেক্ষিতে বাতেনী ইসলামের বিধানাবলী প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তালবীন স্তর অতিক্রম করে তামকীন স্তরে পৌঁছা যাবে না এবং নফ্‌সে মোতমাইন্না (প্রশান্তচিত্ত) এর অধিকারী হওয়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সুলুক স্তরে প্রতিটি পদক্ষেপে সালেক উন্নতির স্তরের প্রত্যাশী থাকবে এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসে-"রাব্বি যিদনি ইলমা"(হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও) এর ধ্বনি করতে থাকবে। প্রতিটি মুহূর্তে সুলুক তরঙ্গ বিশিষ্ট সমুদ্রে হাত-পা

নড়াচড়া করে সাতরাতে থাকবে এবং রঙ বেরঙ্গের ঢেউ তার সামনে আসবে। এক এক লতিফার ছায়ের এক একটি নতুন নতুন পদ্ধতিতে করতে থাকবে। কখনো তার ছায়ের হবে নফ্স স্তরে, কখনও হবে ক্বলব স্তরে, কখনও হবে রূহ স্তরে, কখনও হবে সির স্তরে, কখনও হবে খফি স্তরে, কখনও হবে আখফা স্তরে।

উহার উপর ভিত্তি করে হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী, 'কিতাব থেকে আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা তেলোয়াত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন।' (সূরা আনকাবুতঃ ৪৫)। যার অর্থ এই যে, অর্থাৎ কুরআন শরীফের প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আয়াত সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন; যেগুলো আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ হিসেবে এবং কিতাব অবতরণের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী জ্ঞান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। কুরআন তেলোয়াত ও উহার জ্ঞানের বিস্তারীত তারতীব অনুসরণ করে মুতলাক (স্বতন্ত্র) নামাজ কায়েম করুন। ইহার মর্ম এই যে, জ্ঞানের পূর্ণতা ও সাধারণ আমলের সমন্বয় সাধন করুন। কেননা আপনার জন্য প্রত্যেক আমল চাহিদা অনুযায়ী এক একটি স্বতন্ত্র নামাজ। তাই, কতেক ইলম তার মধ্যে উপকারী যেগুলো আদব, আমল ও জীবনধারণের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টঃ যেগুলো পার্থিব রাজ্যে অদৃশ্য, যেগুলোকে ইলমে কুওত বলা হয়। তম্মধ্যে কতগুলো সম্মানিত জ্ঞান রয়েছে; যেগুলো চরিত্র, ফযিলত (মর্যাদা) এবং পুণরুত্থান দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে উলুমে নফ্স বলা হয়। এই জ্ঞানগুলো বক্ষ ও আকলের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান থেকে অদৃশ্য। কতগুলো জ্ঞান আছে যেগুলোকে কুল্লিয়া লকিনিয়া বলা হয়; যেগুলো সিফত(গুণ) বিষয়ক বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। উহা দুইভাবে বিভক্তঃ(১) আকলিয়া নজরিয়া ও (২) কশফিয়া সিররিয়া। আর এই দুই প্রকার ক্বলব ও সির থেকে গোপন। কতগুলো ইলম আছে যেগুলোকে হাকিকিয়া বলা হয়। যেগুলো তাজাল্লিয়াত (প্রকাশ) ও মুশাহেদাত (দর্শন) এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এগুলো লতিফায়ে রূহ থেকে অদৃশ্য। কতগুলো জ্ঞান আছে যেগুলোকে যুকিয়া লাদুন্নিয়া বলা হয়। যেগুলো ইশক (প্রেম) এবং আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক বিষয়ক বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ইহা লতিফায়ে খেফা থেকে অদৃশ্য। আবার কতগুলো ইলম আছে যেগুলোকে উলুমে হক্কিয়া বলা হয়; যেগুলো গায়বুল গুয়ুব (অদৃশ্যের অদৃশ্য) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক ইলম অনুযায়ী এক একটি নামাজ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ এগুলো মধ্যে শারীরিক ইবাদত অন্তর্ভূক্ত। আর এই ইবাদত শরীয়তের আরকান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ কায়েম করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়টি

সালাতে নফ্স; যেগুলো কাকুতি-মিনতি, নফ্সকে বশীভূতকরণ, সন্তোষ; যেটি ভয় ও আকাংখার মধ্যবর্তী বস্তু, ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয়টি হল সালাতে ক্বলব; যেগুলো হুজুরে ক্বলব ও মোরাকাবার সাথে সংশ্লিষ্ট। চতুর্থটি হল সালাতে সির; যেটি মোনাজাত এবং কথোপকথনের সাথে সংশ্লিষ্ট। পঞ্চমটি হল সালাতে রূহ; যেটি আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ষষ্ঠটি হল সালাতুল খেফাঃ যেটি শ্লীলতা ও নম্রতার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। সপ্তম স্তরে কোন প্রকার নামাজ নেই । কেননা ঐ স্তর শুধুমাত্র প্রেম ও ফানার (বিনাশ) স্তর। যেই স্তরে আল্লাহ্র সত্তার একত্বকে অবলোকন করা হয়। যেমন নিতান্ত সালাত বাহ্যিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহ্র সাথে বান্দার বিচ্ছেদ মৃত্যুর মত নিম্নোক্ত বাণী অনুযায়ী, আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আপনার প্রভূর ইবাদত করুন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে দৃঢ়প্রত্যয়মূলক জ্ঞান আসে'।

এইরূপ প্রকৃতপক্ষে হাকিকি সালাতের সম্পর্ক ফানায়ে মুতলাক (সাধারণ লয়) এর সাথে সংশ্লিষ্ট; যেটি হক্কুল ইয়াকীন পর্যায়ভুক্ত। আর ফানার পরবর্তী স্তর হল বাকা স্তর। এই স্তরের উপরে ছয় প্রকারের নামাজ রয়েছে এবং সালাতুল হক; যেটি মহববত বা প্রেমে একক সত্তার পর্যায়ভুক্ত; যা সালেকের উপর আরোপিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সূরা আনকাবুত, পৃ:৬৪, ২য় খণ্ড- এ বর্ণিত আছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে নামাজ কায়েম কর।"(সূরা বণি ইসরাইল)। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে; যার অনুবাদ হল- জেনে রাখ! নামাজ পাঁচ প্রকার। প্রথম সালাতুল মুওয়াসালা ওয়াল মুনাগাত; যেটি খেফা স্তরের পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়টি সালাতুস শুহুদ; ইহা রূহ স্তরের পর্যায়ভুক্ত। তৃতীয়টি হল- সালাতুল মোনাজাত; ইহা সির স্তরের পর্যায়ভুক্ত। চতুর্থটি সালাতুল হুজুর; যেটি কলব স্তরের পর্যায়ভুক্ত। পঞ্চমটি সালাতুল মুতাবিয়াত ওয়াল ইনকিয়াদ; যেটি নফ্স স্তরের পর্যায়ভুক্ত। অতঃপর সূর্যের ঢলে যাওয়ার মর্মার্থ হল-ওয়াহদাত (একত্ববাদ) এর সূর্য খাড়া অবস্থা থেকে ঢলে যাওয়া। তখন বান্দার অস্তিত্ব কেবল ফানাই মুখ্য। কেননা সূর্য খাড়া থাকা অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ নয়। কেননা নামাজ হল কেবল একটি আমল। নামাজ পালনকারী অস্তিত্ব ব্যতিত ইহা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। এই অবস্থায় বান্দার অস্তিত্ব এক রকম অস্তিত্বহীন, তাহলে নামাজ কে আদায় করবে?

মূলতঃ যখনি সালেক (খোদা পথচারী) উন্নতির স্তরে পদায়ন করেন, তার ইবাদতের সওয়াব অন্যের ইবাদতের সওয়াব থেকে অনেক বেড়ে যায়। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

'যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে, তা আমার সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এঁর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়কৃত এক বা অর্ধসের যব সমপরিমাণ হবে না'।

হযরত আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন- একরাতে অনেক তারকারাজি স্বচ্ছ আসমানে আমি অবলোকন করলাম। সেই সময় রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁর পূণ্য এই তারকারাজির সমপরিমাণ হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তিনি হলেন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক কেমন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সমস্ত পূণ্য হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর একটি পূণ্যের সমপরিমাণ।

হযরত মওলানা সানাউল্লাহ পানিপথি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'ইরশাদুত্তালেবীন' গ্রন্থে লিখেন যে, ঐ কথাটির রহস্য হল সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার বৃত্তের একটি ছায়া মাত্র। যখন সালেক স্বীয় সায়ের ও সুলুক স্তরে উন্নতি করেন, তখন তিনি অন্ধকার বৃত্ত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন এবং তাতে তিনি ফানা ও বিলীন প্রাপ্ত হন। দায়েরায়ে যিলাল (অন্ধকার বৃত্ত); যেটি আল্লাহ্‌র সন্নিকটে, তখন তার নৈকট্য ঐ সালিকের অর্জিত হয়। তখন সমগ্র বিশ্ব জগত অন্ধকারের পরিবর্তে তাঁর চাক্ষুষ দৃষ্টিগোচর হয় এবং পৃথিবীবাসীদের সমস্ত গুণাবলী তাঁর (সালেক) ইবাদতের তুলনায় সিফাত (গুণাবলী) ও ইবাদতের ছায়া হিসেবে পরিগণিত হয়। অতঃপর যেই পরিমাণ পার্থক্য আসল (মূল) ও ছায়ার মধ্যে রয়েছে, সেইরূপ পার্থক্য ঐ সালেক ও অন্যান্যদের হবে। যেই ব্যক্তি তাঁর (সালেক) নিম্ন স্তরে অবস্থান করবেন, সেই ক্ষেত্রে উর্ধস্তরে অবস্থানকারী সালেককে আসল হিসেবে ধরা হবে এবং তাঁর নিম্ন স্তরে অবস্থানকারী সালেককে ছায়া হিসেবে ধরা হবে। অতঃপর যখন উর্ধস্তর অর্জন হয়ে যায়, তখন নিম্ন স্তরসমূহ আসল (মূল) এর সাথে কেমন নিসবত রাখবে? যদি মেনে নেওয়া হয়, কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার বছর ইবাদত করে নিম্ন স্তরের কোন অলির মর্তবায় অভিষিক্ত হওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয়ে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছর।'(সূরা মা' আরিজঃ ৪)। যখন দুনিয়ার সমগ্র জীবন এইরূপ নয়, তাহলে শুধুমাত্র রিয়াজত ও মোজাহেদা করে

বেলায়ত অর্জন অসম্ভব ও কল্পনাতীত। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

পংক্তি

'যাহেদ (তপস্বী) ব্যক্তি এক রাতে একদিনের পথ অতিক্রম করতে পারেন। আর আরেফ ব্যক্তি প্রতি নিঃশ্বাসে বাদশাহের সিংহাসন পর্যন্ত সায়ের করতে পারেন'।

মাশায়েখে কেরাম যাঁরা স্বীয় মুরীদদেরকে রিয়াজত ও মোজাহাদা করার নির্দেশ দেন, ইহা দ্বারা শুধুমাত্র তার আমল সমূহের পরিশুদ্ধতা ও নফ্সের পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য। বেলায়ত ও নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য নয়। বরং তাযকিয়া (পবিত্রতা) ও তাসফিয়া (পরিশুদ্ধতা) যতক্ষণ পর্যন্ত মাশায়েখে কেরামদের ছোহবতের প্রভাব দ্বারা মুরীদের অর্জন না হবে, শুধুমাত্র ইবাদত দ্বারা তা অর্জিত হবে না। সারমর্ম এই যে, সালেকের যাত্রা হল সর্বদা উন্নতির দিকে আরোহণ করা এবং যখনি সালেক একদিন সেই উন্নতির পথে যাত্রা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন। অতঃপর সালেক যতই উপরের দিকে আরোহণ করেন এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছেন এবং কুরব (নৈকট্য) এর স্তর সমূহ ও তাওহীদের ময়দান অতিক্রম করে উপরের স্তর সমূহে অবস্থান করেন, তখন তাঁর কাছে প্রথম পর্যায়ের স্তর সমূহ অন্ধকার এবং অপূর্ণ মনে হয়। তখন তিনি আগের স্তরকে অপূর্ণতা ও গুনাহ হিসেবে বিবেচনা করেন। সেই কারণে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'নেককারদের (সৎকর্মশীল) ভাল কাজ মুকারেরবীন (নৈকট্য প্রাপ্ত) এর নিকট পাপ হিসেবে গন্য'[১]।

পংক্তি

সাধারণের পূণ্য কাজ খাস ব্যক্তিদের কাছে পাপ হিসেবে গণ্য।

এই জন্য রাসূল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনে সত্তর বার অথবা একশত বার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন এবং ইরশাদ করেন- 'পাতলা মেঘের মত আমার অন্তরে আবরণ সৃষ্টি হয়'। তাই এই স্তরকে হযরত মাহবুবে সুবহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) "ফতহুল গায়ব" কিতাবে সপ্তম মক্বালায় (অধ্যায়) উল্লেখ করেন। শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী

[১] তাফসীরে ইবনে আরবী এই হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। পৃ: ১১৪ এবং এই তাফসীরের অধীনে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন- "কেহ কোন সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে।" (সূরা আনয়াম-১৬০)।

নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন। আল্লাহর বাণী- "আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"। ফাতহে রাসূল (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর বিজয়) তিন প্রকার। প্রথমটি হল- ফাতহে ক্বরিব (নিকটবর্তী বিজয়)। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- "ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।" (সূরা ফাতাহঃ ২৭)। এই আয়াতটি সেই দিকে ইঙ্গিতবহ; আর ইহা হল ক্বলব (অন্তর) এর দ্বার সমূহে বিজয় লাভ করা। এইভাবে যে, অদৃশ্য বস্তুগুলো দৃশ্যমান হিসেবে আবলোকন করা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী নুর হাসিল করা। আর এই বিজয়টি নফ্‌স স্তর থেকে উন্নতি করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর এতে অধিকাংশ মুমিন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে অংশিদার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-"এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।"(সূরা সাফ্‌ফ-১৩)। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন- "তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" (সূরা ফাতাহঃ ১৮)।

এবং যখন 'মুমিনদের আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন' আয়াতটির মর্ম হল- স্বর্গীয় নুরের ফয়েজ ও সিফাত (গুণ) সমূহ প্রকাশের সুসংবাদ এবং পবিত্র তথ্য সমূহের দৃশ্যমানতাকে অর্জন করা ঐ বিষয়ের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ' বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লভ্য সম্পদ, যা ওরা হস্তগত করবে।' (সূরা ফাতাহঃ ১৯)। দ্বিতীয়টি ফাতহে মুবীন (সুস্পষ্ট বিজয়); যেহেতু ঐ আয়াতে এটিই উদ্দেশ্য। আর তা'হল- রূহী (আধ্যাত্মিক) নুরের প্রকাশ এবং কলব-এর উন্নতিকল্পে রূহ স্তর অর্জিত হয়। ঐ অবস্থায় নফ্‌স কলব স্তরের দিকে উন্নতি লাভ করে। আর উক্ত স্তরের আবশ্যকীয় গুণাবলী এবং মন্দগুণাবলী; যেটি এই ফাতহ (বিজয়) এর পূর্বে এই স্তরে ছিল, কলবের নুর প্রকাশ ও বিকাশ হওয়ার কারণে তা একেবারে বন্ধ ও সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। নিম্নোক্ত আয়াতটিতে উক্ত কথার মর্মার্থ ফুটে উঠেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'যেন আল্লাহ আপানার অতীত ত্রুটি সমূহ মার্জনা করেন।' (সূরা ফাতাহঃ ২)। এই রূপ জ্যোতির্ময় অবস্থা; যেটি ক্বলবের নূর দ্বারা আলোকিত অবস্থা থেকে তালবীন নামক স্তরে প্রকাশ পায় এবং নফ্‌স এর অবস্থাকে গোপন করে, উহাও এই স্তরে অকাট্যভাবে দূরীভূত এবং বিলীন প্রাপ্ত হয়। কেননা প্রথম বিজয় অর্থাৎ ক্বলব স্তরে প্রত্যেক নফ্‌সের প্রাথমিক অবস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে দূরীভূত হয়ে গেল। কিন্ত আলোকময় (নুরানীয়া) অবস্থা; যেটি উক্ত তিনটি কলবের নুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহার বিদূরণ ওখানে সম্ভব ছিল না। কেননা ক্বলব স্তরের পূর্ণতা রূহ স্তরে উন্নতি হওয়ার মাধ্যমে এবং ক্বলব রূহী নুরের অধিকারী হওয়ার পর হয়ে থাকে। সেই কারণে তালবীনে ক্বলব

(কলবের প্রকৃতি) এর প্রকাশ এবং তালবীনে নফ্স (নফ্সের প্রকৃতি) পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়া, যেটি ক্বলব স্তরে বিকশিত হয়; যা রূহ স্তরে অর্জিত হয়। আল্লাহ্র বাণী- ' পরবর্তী ত্রুটি সমূহ।' (সূরা ফাতাহঃ ২)। আয়াতটির দ্বারা উদ্দেশ্য নফ্সের এই পাপ বা ত্রুটি দূরীভূত হওয়া।

তৃতীয়টি হল- ফাতহে মুতলাক (সাধারণ বিজয়); যেটি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে-"যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়।' (সূরা নাসরঃ ১)। আর এটি হল ওয়াহদাত (একত্ববাদ) এর বিজয়। সাথে ফানায়ে মুতলাক (সাধারণ লয়) এবং একক সত্তার দর্শন এবং নুরে আহমদীর বিকাশের মধ্যে মগ্ন হয়ে সঠিকভাবে এর সংযোজন করার মাধ্যমে। উক্ত বিজয়ের চারটি বিষয় অর্থাৎ উল্লেখিত মাগফিরাত (ক্ষমা), গুণবাচক নিয়ামত সমূহের পূর্ণতা, জামালীয়া (সৌন্দর্য) ও জালালিয়া (বুজুর্গী) এর দর্শন কলব স্তরের পূর্ণ হওয়ার কারণে এবং একক সত্তার পথের দিকে যাত্রা; যেটি সুলুক ফিস সিফাত (গুণাবলীতে সুলুক) এবং নুরানী পর্দার স্ফুরণ এবং প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

যার ওসিলায় আমিত্বের ফানা (বিনাশ), উছুল (নিয়ম-নীতি), বদান্যতার প্রকৃতি এবং সিফাত সমূহ অর্জনে সহায়তা করে; যেটি ফানায়ে মহজ (নিছক বিনাশ) পরবর্তী স্তরে অবতীর্ণ করে। আর উহা প্রবল সাহায্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। জেনে রাখ যে, যাহেরী ও বাতেনী ইসলাম উভয়টির মধ্যে শাখা বিধান সমূহ মুকাল্লিফ (শরীয়তের বিধান পালনে কষ্ট সহ্যকারী) এর অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেহেতু মুকাল্লিফদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সেজন্য যাহেরী ও বাতেনী ইসলামের শাখা বিধান সমূহ, মশরব (চলনভঙ্গি), পথ, নুর আহরণ এবং সিরাতুল মুস্তাকিম (সরলপথ) প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ও আলাদা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীয়ত ও ত্বরিকত এক স্তরের এবং এক মর্তবার নয়। যদিও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সবাই অংশিদার। হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন। আল্লাহ্র বাণী- 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।' (সূরা মায়েদাঃ ৪৮)। এর মর্মার্থ হল- তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য আমি এক একটি শরীয়ত নির্ধারণ করেছি এবং এক একটি রাস্তা নির্ধারণ করেছি; যেগুলো নফ্স, ক্বলব এবং রূহ এর স্তরের অনুরূপ এবং এক একটি ত্বরিকা (পদ্ধতি) নির্ধারণ করেছি; যেগুলো শরীয়তের বিধানাবলী ও পরস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত জ্ঞান; যা ক্বলবের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সুলুকের (আল্লাহ্র রাস্তায় পথচলা) অনুরূপ বাতেন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি; যেগুলো জান্নাতের গুণ বিশিষ্ট বিষয়ের দিকে

পৌঁছিয়ে দেয়। তাওহীদ ও মোশাহেদা বিষয়ক জ্ঞানের অনুরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি; যেগুলো রূহের সাথে সম্পর্কিত। আর সুলুকের অনুরূপ ফানা (বিলীন) পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি; যেটি জাতি জান্নাত (প্রকৃত জান্নাত) এর দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারতেন। একটি উম্মতে পরিগণিত করতে পারতেন। নব জম্মগ্রহণকারী শিশুর প্রকৃতিস্থ তাওহীদের উপর একমত পোষণকারী হিসেবে এবং একটি দীন, একটি পথের উপর একমত পোষণকারী হিসেবে পরিগণিত করতে পারতেন। কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে সেই বিষয়ে; যা তোমাদের প্রদান করা হয়েছে। প্রকাশ করা হবে সেই বিষয়; যেগুলো তোমাদের দান করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেকে তার পরিমাণমত তা গ্রহন করেছ।

কিন্তু কামালাত (আধ্যাত্মিক পূর্ণতা) এর ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয় তোমরা গ্রহণ কর; যেগুলো তোমাদেরকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। যেগুলো আল্লাহ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এগুলো পূর্ণতার নৈকট্যকারী এবং সাথে সাথে ঐ পূর্ণতাকে সামর্থ্যের শক্তি অনুযায়ী কার্যে বাস্তবায়নের দিকে দিক নির্দেশকারী। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী তাদের পথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং একই অবস্থা, একই পথ ও মতের উপর সৃষ্টিগত দিক থেকে ঐকমত্য হয়ে যাওয়া অসম্ভব। অতঃপর, প্রত্যেকের উপর নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের যেই বিধান আরোপ করা হয়েছে, তা মন-প্রাণ দিয়ে পালন করা এবং নিজ নিজ অবস্থানে বহাল থাকা এবং স্বীয় মর্তবা (স্তর) কে সংরক্ষণ করা, ইহাই তাহার শরীয়ত। নিজ নিজ মর্তবা (স্তর) এর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং স্বীয় স্তর ও নির্ধারিত গণ্ডির সীমালংঘন করা পাপ ও কুফরি। হযরত মাহবুবে সোবহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 'ফতহল গায়ব' কিতাবে চল্লিশতম মক্বালা (অধ্যায়) এ বলেন- 'যার হাকিকত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যপারে শরীয়ত স্বাক্ষ্য দেয় না, সে যিন্দিক, কুফরিকারী এবং নাস্তিক'।

কবিতাংশ

নিজ স্তর সংরক্ষণ না করাই হল যিন্দিকী বা কুফরি।

হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'কিতাবুত তাজাল্লিয়াত' গ্রন্থে লিখেন যে, যার অনুবাদ হল- জেনে রাখ যে, যে ব্যক্তি তাওহীদ (একত্ববাদ) এর ক্ষেত্রে অবহেলা করল এবং শরীয়তের সাথে

সম্পর্কিত থাকল না, সে যিন্দিক বা কুফরির সমুদ্রে ডুবে গেল। কিন্তু অবস্থা এই যে, হাকিকতের সাথে সর্বদা সংযুক্ত থাকবে এবং শরীয়তের সাথে যুক্ত থাকবে। মূলকথা হল- তরিকত ও হাকিকত এর প্রত্যেক স্তরে শরীয়ত সংযুক্ত। কেননা শরীয়ত হল শুয়ুনাতে তৌহিদী এবং ইতেবারাতে ওজুদিকে[১] বলা হয়, অন্য বিষয়কে নয়।

সেই জন্য তরিকত ও হাকিকতের প্রতিটি পদক্ষেপে শরীয়ত বিদ্যমান। উহার প্রতিটি স্তরে শরীয়তের দিকে দৃষ্টি রাখা পূর্ণাঙ্গ ফরজ, ওয়াজিব এবং আবশ্যক। হযরত শামস তাবরিজি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

'শরীয়তকে এখনই প্রাধান্য দাও, তরিকত শরীয়ত থেকে আলাদা নয়'।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কারো হুশ চলে যাওয়ার কারণে ভারসাম্য পূর্ণ কথাবার্তা বলতে ভুলে যায়, তাহলে সেই অবস্থায় তার কথার উপর নির্ভর ও আমল করা অন্য জনের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির শরীয়ত বিরোধী কথা বলা তার আকল ও হুশ লোপ পাওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনীয়। আর তার ব্যপারে ইহা শরীয়তের ছাড়। আর শরীয়তের ছাড় মূলত শরীয়তের বিধানাবলী প্রয়োগে ছাড়া প্রদান করা। অতঃপর তার শরীয়ত হল ভারসাম্যহীন বা শরীয়ত বিরোধী কথা বলা এবং সুস্থ আকলের অধিকারী ব্যক্তির জন্য তার কথার উপর আমল না করা শরীয়ত। অতঃপর তা অনুধাবন কর এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট করে দিবে। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত, তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ়।

[১] শরীয়ত নাছুত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ। যাহাকে শইউনাতে তৌহীদী এবং মায়ামেলাতে অজুদী বলে (হোসাইন, বেলায়তে মোতলাকা)।

৭ম ফরতু : শাজরায়ে আলীয়া এবং কিতাবের সমাপ্তি প্রসঙ্গ

ইহা সুমহান পরিত্রাণদানকারী শাজরায়ে ক্বাদেরিয়া আহমদিয়া গাউছিয়া।

পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত (সূরা ইব্রাহীম: ২৪)।

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

হে আল্লাহ! শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পরিবারের উপর।

১. হে আল্লাহ! খোদা তালাশকারীদের লক্ষ্যস্থল, আ'রেফদের অন্যতম, নৈকট্য লাভকারীদের সুলতান, আসমান ও যমীনের কুতুব এবং জগতের আলোকবর্তিকা গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায়।
২. হে আল্লাহ! খোদা তালাশকারীদের লক্ষ্যস্থল, হাজিউল হারামাইন শরীফাইন, ভারতবর্ষের সুলতান হযরত সুফী আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ লাহোরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৩. হে আল্লাহ! সালেকদের আদর্শ, আ'রেফদের অন্যতম, আল্লাহ্‌র দিকে দিশাদানকারী আলহাজ্ব সুফী শাহ লক্বিয়ত উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৪. হে আল্লাহ! আশেকদের পথ প্রদর্শক শাহ সুফি আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৫. হে আল্লাহ! সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, সরল পথের পথপ্রদর্শক, চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসাকারী, বাংলার কুতুব সূফি শাহ্ মুহাম্মদ দায়েম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৬. হে আল্লাহ! খোদা তালাশকারীদের উদ্দেশ্যস্থল, আসমান ও যমীনের কুতুব, শায়খদের অন্যতম সূফি শাহ মওলানা মুহাম্মদ মুনয়িম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৭. হে আল্লাহ! আ'রেফদের সর্দার, কামিলদের অন্যতম সূফি শাহ খলিল উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৮. হে আল্লাহ! শাহ মুহাম্মদ জাফর আল-হোসাইনী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
৯. হে আল্লাহ! শাহ আহলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

১০. হে আল্লাহ! শাহ নেজাম উদ্দিন আল-ক্বাদেরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১১. হে আল্লাহ! শাহ্ তক্বি উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১২. হে আল্লাহ! সৈয়দ শাহ নাসির উদ্দিন আল-ক্বাদেরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৩. হে আল্লাহ! সৈয়দ শাহ মাহমুদ আল-ক্বাদেরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৪. হে আল্লাহ! শাহ্ ফজলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৫. হে আল্লাহ! উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী কুতুব উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৬. হে আল্লাহ! শাহ নজম উদ্দিন আল-গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৭. হে আল্লাহ! শাহ মোবারক আল-গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৮. হে আল্লাহ! শাহ নেজাম উদ্দিন আল-গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
১৯. হে আল্লাহ! শায়খদের অন্যতম শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
২০. হে আল্লাহ! শায়খ গাউছে ছাকলাইন (মানব ও জিনদের ক্রাণকর্তা), সৈয়দ আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল ক্বাদের আল-জিলানী, আল-হাসানী, আল-হোসাইনী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
২১. হে আল্লাহ! শায়খদের শায়খ শাহ আবু সাঈদ বিন মোবারক মাখযুমী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
২২. হে আল্লাহ! শাহ আবুল হাসান আল-কুরাইশী, আল-হান্‌কারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।
২৩. হে আল্লাহ! শাহ ইউসুফ আল-তরতুসী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়[১]।

[১] মুহাম্মদ ইউসুফ আবুল ফারাহ তারতুসী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ২১ আগস্ট ১০১৬ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার তারতুসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস তারতুসী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইউসুফ। বংশগত নাম আবুল ফারাহ। তিনি ২৮ অক্টোবর ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ইরাকের বাগদাদ নগরীতে তাঁর পবিত্র সমাধি অবস্থিত। উনার পীরে তরিকতের নাম আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহিদ ইয়েমেনী তামিমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)। (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

২৪. হে আল্লাহ! শাহ আব্দুল ক্বাদের আল-ইয়ামেনী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়[১]।

২৫. হে আল্লাহ! শাহ রহিম উদ্দিন আল-আয়ায (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

২৬. হে আল্লাহ! শায়খ আবু বকর আল-শিবলী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

২৭. হে আল্লাহ! শায়খদের শায়খ, জোনাইদ আল-বাগদাদী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

২৮. হে আল্লাহ! শায়খদের শায়খ সিররী সাক্বতি (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

২৯. হে আল্লাহ! শায়খ মা'রুফ কারখি (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

৩০. হে আল্লাহ! মানব ও জিন জাতির সর্দার ইমাম মুসা রেযা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

৩১. হে আল্লাহ! সৈয়দ ইমাম মুসা কাযেম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

---

[১] সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) সম্পাদিত 'গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) জীবনী ও কেরামত' এবং তাঁর রচিত 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া' গ্রন্থদ্বয়ের তথ্য সূত্র মতে কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারী তরিকার শাজরা শরীফে শাজরার অধঃক্রম অনুযায়ী (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিচের দিকে) ১২ নং ক্রমে শায়খ আবু বকর আল-শিবলী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ), ১৩ নং ক্রমে শেখ আব্দুল আজিজ বিন হারিস আসাদ ইয়েমেনী তামিমী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) এবং ১৪ নং ক্রমে হযরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী ইয়ামেনী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) এঁর নাম পাওয়া যায়। 'আয়নায়ে বারি' গ্রন্থকারের তথ্য অনুসারে শাজরার উর্ধক্রম অনুযায়ী (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু থেকে উপরের দিকে) ২৪ ও ২৫ নং ক্রমে যথাক্রমে শাহ আব্দুল ক্বাদের আল-ইয়ামেনী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) ও শাহ রহিম উদ্দিন আল-আয়ায (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) এঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী ২৪ ও ২৫ নং ক্রমে যথাক্রমে শেখ আব্দুল আজিজ বিন হারিস আসাদ ইয়েমেনী তামিমী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) (শাজরার অধঃক্রম অনুযায়ী ১৩ নং) এবং হযরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী ইয়ামেনী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) (শাজরার অধঃক্রম অনুযায়ী ১৪ নং) নাম থাকার কথা। শাহ আব্দুল ক্বাদের আল-ইয়ামেনী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) ও শাহ রহিম উদ্দিন আল-আয়ায (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) নামদ্বয় আমরা শাজরায় নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে পায়নি। কেননা নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী শায়খ আবু বকর আল-শিবলী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন শেখ আব্দুল আজিজ বিন হারিস আসাদ ইয়েমেনী তামিমী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ) এবং তাঁর থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন হযরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী ইয়ামেনী (কাদ্দাছাছির্‌রাহুল আজিজ)। (অনুবাদক)

৩২. হে আল্লাহ! ইমাম জা'ফর সাদেক (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায়।

৩৩. হে আল্লাহ! সৈয়দ ইমাম মুহাম্মদ আল-বাক্বের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায়।

৩৪. হে আল্লাহ! সৈয়দ ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায়।

৩৫. হে আল্লাহ! সৈয়দ, জগতের সর্দার, শহীদদের সর্দার হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায়।

৩৬. হে আল্লাহ! আমিরুল মুমেনীন আলী বিন আবু তালিব (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এঁর অসিলায়।

৩৭. হে আল্লাহ! খাতেমুল মুরসালীন, জগত প্রতিপালকের রাসূল, আমাদের সর্দার, আমাদের মওলা আহমদ আল-মুজতাবা, মুহাম্মদ আল-মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অসিলায়।

আল্লাহ অসংখ্য শান্তি ও বরকত বর্ষিত করুন তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সঙ্গী-সাথী, তাঁর উম্মতের আউলিয়াদের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য; যিনি জগতের প্রতিপালক। আমিন! আমিন!

এই পবিত্র শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া; যেটি স্থায়ী নিয়ামত দানকারী নিম্নে কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করা হল।

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

১. হে প্রভূ! রাজাধিরাজ গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে- আমার নিজেকে গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত করুন।

২. শাহ মুহাম্মদ সালেহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে খারাপ লোকের সঙ্গ থেকে পরিত্রাণ দিন।

৩. হে প্রভূ! সূফিদের শাহান শাহ, বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী লক্বিয়ত উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে।

৪. দানশীল আশেক পূর্ণ মা'রেফতের অধিকারী আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে।

৫. আমি আপনার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি-মুহাম্মদ দায়েম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর গুপ্ত রহস্যের বরকতে।

৬. হে প্রভূ! যুগের মুনয়িম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর বরকতে আমার ভাগ্যকে ঈমানের সম্পদ দ্বারা সাজিয়ে দাও।

৭. খলিল উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রওজার খাতিরে আমাকে সিদক (সত্যবাদিতা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জ্ঞান) এর সমাবেশে পৌঁছিয়ে দাও।
৮. হে প্রভূ! জিন ও মানবের ইমাম সৈয়দ জাফর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে।
৯. হে প্রভূ! আহলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে আমাকে নিজের গুপ্ত রহস্য সম্পর্ক সচেতন করুন।
১০. হে প্রভূ! নেজাম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর উদ্দীপনার মাধ্যমে আমাকে যথা সম্ভব আ'রেফ (মা'রেফতের অধিকারী) করে দিন।
১১. হে প্রভূ! খোদাভীরু তকি উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর আশেকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন।
১২. হে প্রভূ! নাসির উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় আমার অন্তরকে ইয়াকীনের নুর দিয়ে আলোকিত করে দিন।
১৩. হে প্রভূ! সৈয়দ মাহমুদ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর বরকতে আমাকে উদ্দিষ্টস্থলের সমুদ্র দ্বারা সমৃদ্ধ করুন।
১৪. হে প্রভূ! ফজলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ফয়জের বরকতে উভয় জগতে আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করুন।
১৫. হে প্রভূ! কুতুব উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে অনুগ্রহ ও দৃঢ়তা দ্বারা আমার অন্তরকে আলোকিত করুন।
১৬. হে প্রভূ! নজম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে আমাকে ইয়াকীন (দৃঢ়তা) আকাশের চন্দ্র করে দিন।
১৭. মর্যাদাবান মোবারক (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে উভয় জগত সম্পর্কে আমাকে আ'রেফ করে দিন।
১৮. নেজাম উদ্দিন গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী আলোক চক্ষু প্রাপ্ত হই।
১৯. আউলিয়াদের উৎসস্থল ইমাম শিহাব উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পবিত্র রূহের বরকতে।
২০. উভয় জাহানের বাদশাহ, উম্মতের ইমাম গাউছুল আজম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে।

২১. সৌভাগ্যবান আবু সাঈদ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের খাতিরে আমাকে ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মত ইশকের শরাবের পেয়ালা দিন।

২২. হে প্রভূ! আবুল হাসান (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর রূহের বরকতে সর্বদা আমাকে আনন্দ ও খুশি দান করুন।

২৩. হে প্রভূ! ইউসুফ তরতুসী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় আমার অন্তর আমার দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

২৪. আব্দুল ক্বাদের ইয়ামেনীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) খাতিরে আমাদের অন্তরকে সর্বদা অমুখাপেক্ষী করে দিন।[১]

২৫. হে প্রভূ! রহিম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় আমাকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করুন।

২৬. হে প্রভূ! হযরত শিবলী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর বরকতে আমাকে নবী (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর খাদেমদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

২৭. হে প্রভূ! জোনাইদ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পবিত্র রূহের বরকতে আমাকে স্থায়ী সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিন।

২৮. খাজা সিররে সাকতীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) খাতিরে আমার উপর এ সমস্ত কঠিন বিষয় সমূহকে কোমল করে দিন।

২৯. হে প্রভূ! মারুফ করখী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বরকতে বিপদ-আপদ ও শাস্তি থেকে আমার গৃহকে রক্ষা করুন।

৩০. মুসা রেযার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সুমহান রূহের বরকতে আমার গৃহকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন।

৩১. হে প্রভূ! মুসা কাযেম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বরকতে আমার অন্তরকে আমার দিকে সুদৃঢ় করুন।

৩২. হে প্রভূ! সুমহান মকামের অধিকারী বাদশাহ, এই মানব জাতির ইমাম জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বরকতে।

৩৩. জিন ও মানব জাতির ইমাম, ধর্মের সর্দার মুহাম্মদ বাক্বের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর রূহের বরকতে।

৩৪. হে প্রভূ! জয়নুল আবেদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর রূহের বরকতে স্বীয় অনুগ্রহে আমার সমস্যা সমাধান করে দিন।

৩৫. হে প্রভূ! হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র রূহের বরকতে উভয় জগতের সম্পদ দিয়ে আমার ভাগ্যকে প্রসন্ন করে দিন।

---

[১] প্রাগুক্ত।

৩৬. হে প্রভূ! চির বিশ্বস্থ অভিভাবক আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বরকতে।

৩৭. হে প্রভূ! মীম বর্ণযুক্ত আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম);যিনি উভয় জগতের বাদশাহ ও আবশ্যকীয় সম্মানের অধিকারী তাঁর বরকতে। বিচার দিবসে আমার সমস্ত অপরাধগুলোকে ক্ষমা করুন। আমাকে ভয় ও শাস্তি থেকে রেহাই দান করুন।

সমাপ্ত

ইহা পরিত্রাণকারী, সত্য সুদৃঢ় ধর্মের শজরায়ে আলীয়া ক্বাদেরিয়া অর্থাৎ অমুককে (গ্রন্থকার) ঈমানের স্বাদ ও আগ্রহ স্থায়ী করে দিন। আমাদের ও তোমাদের শেষ পরিণতি ও জীবনের সমাপ্তিকে সম্মানিত নবী (আলাইহিস্সালাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের অসিলায় কল্যাণময় করে দাও। আল্লাহ যথেষ্ট, বাকি সব কামনা-বাসনা।

শাজরায়ে আলীয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারী আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত এবং মহান কিতাবের সুন্দর পরিসমাপ্তি।

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

হে খোদা! আমাকে তোমার স্বীয় রহমত দ্বারা তোমার ইশকের পাগল বানিয়ে দাও।

হে খোদা! রাসূলদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদশাহ এঁর অসিলায় আমার অন্তরের কুঁড়িকে বিকশিত করে দাও।

হে খোদা! মহাপুরুষদের বাদশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায় আমাকে তোমার মিলন দ্বারা প্রফুল্ল করে দাও।

হে খোদা! কারবালা প্রান্তরের শহীদদের অসিলায় ভালবাসার ছুরি দিয়ে আমার প্রাণ সংহার কর।

হে খোদা! জয়নুল আবেদীন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় আমার প্রাণকে তোমার দর্শক বানিয়ে দাও।

হে খোদা! সত্যপন্থী বাকের (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে তোমার পূর্ণ গুপ্ত রহস্য বলে দাও।

হে খোদা! জা'ফর সাদিকের (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) খাতিরে আমার অন্তরে তোমার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দাও।

হে খোদা! মুসা কাযেম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অসিলায় তোমার সুগন্ধি দ্বারা আমার প্রাণ-মস্তিষ্ককে সুঘ্রাণযুক্ত কর।

হে খোদা! মুসা রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর খাতিরে তোমার মর্জি অনুযায়ী আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।
হে খোদা! মা'রুফ করখী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ইজ্জতের খাতিরে আমাকে আশেকদের মধ্যে উজ্জ্বল চেহারা দান কর।
হে খোদা! সিররে সাকতী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর সম্মানের খাতিরে আমাকে তোমার ইশক দান কর।
হে খোদা! পবিত্র জোনাইদ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর সম্মানের খাতিরে তোমার ইশকে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান কর।
হে খোদা! আউলিয়া প্রধান শিবলী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর খাতিরে আমাকে তোমার একত্ববাদ সম্পর্কে অবগত কর।
হে খোদা! রহিম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে অন্যের ভালবাসা থেকে আমাকে মুক্ত কর।[১]
আব্দুল কাদের ঈয়ামেনী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে ইশকের জ্ঞানে আমাকে দক্ষ করে দাও।
সত্যপন্থী ইউসুফ তারতুসী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে ইশকের পথে আমাকে তৌফিক দান কর।
হে প্রভূ! আবুল হাসান হানকারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে ইশকের পথে আমাকে সুশীল রাখ।
শাহ আবু সাঈদ মাখযুমী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তোমার রহস্য আমার অন্তরে জানিয়ে দাও।
হে খোদা! অধিক সম্মানিত ও প্রশংসাকারী কুতুব গাউছুল আজম মহিউদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তোমার ইশকের শরাব পান করিয়ে দাও এবং তোমার ইশকে পাগল বানিয়ে দাও।
শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) সম্মানের খাতিরে হে প্রভূ! আমাকে তোমার মিলন দান কর।
হে খোদা! নেজাম গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে তোমার একত্ববাদের সত্যায়নকারী কর।
শাহ মোবারক গজনভী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় তোমারই কামনায় অন্তরকে বরকতময় কর।
অধিক প্রশংসিত শাহ নজম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে চিরন্তন রাজ-রহস্য জানিয়ে দাও।

---

[১] প্রাগুক্ত।

খোদা দ্রষ্টা কুতুব উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তোমার আশেকদের মধ্যে আমাকে জ্ঞানী করে দাও।
দানশীল শাহ ফজলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তুমি আমার অন্তরকে ইশক দ্বারা আবাদ করে দাও।
সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী সৈয়দ মাহমুদ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তুমি আমাকে তুমি ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত কর।
অধিক প্রশংসিত শাহ নাসির উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে ইশক ও চিরন্তন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান কর।
অধিক সম্মানিত তকি উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তুমি তৌহিদ দ্বারা আমাকে সম্মানিত কর।
হে প্রভূ! আউলিয়াদের সর্দার নেজাম উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে উদাসীনতা থেকে সচেতন কর।
রহস্যবাদী শাহ আহলুল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে দুনিয়াতে আমাকে তোমার আসক্ত করে দাও।
হে খোদা! সৈয়দ জা'ফর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তৌহিদের রহস্য আমাকে দান কর।
জ্যোতির্ময় শাহ খলিল উদ্দিন (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমাকে আমার ব্যাপারে কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করিও না।
শাহ মওলানা মুনয়িম (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আশেকদের মধ্যে আমাকে লজ্জিত করিও না।
হে প্রভূ! শাহ মুহাম্মদ দায়েমের (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) খাতিরে আমাকে তোমার পরিপূর্ণ নূর অবলোকন করাও।
শান-শওকতের অধিকারী আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে আমার অন্তরকে তোমার ইশকের খনি বানিয়ে দাও।
সম্মানিত শাহ লকিয়ত উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে তোমার ইশকে যেন আমার নিঃশ্বাস নির্গত হয়।
সত্যপন্থী শাহ মুহাম্মদ ছালেহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর অসিলায় আমাকে পরিপূর্ণ রাজ-রহস্য অবগত করাও।
রাজাধিরাজ, প্রাণের প্রাণ গাউছুল আজম মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর খাতিরে জগতে ইশক দ্বারা আমার অন্তরকে আবাদ রাখ। সর্বদা তোমার মিলন দ্বারা প্রফুল্ল রাখ। যদিও রুমী ও সেকান্দর না হই-কিন্তু খোদা দর্শনের দর্পনকে রাখি আলোকময়।

আমার আয়না যেন ঝাপসা না হয়-তবে আমি তোমার সেকান্দরি আয়নার ভিখারী।
আমার অন্তরে খোদার আয়না থাকুক- উহাতে তোমারই নুর করে যেন জ্বলমল।
প্রতিক্ষণে আয়না যেন থাকে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল-তাতে প্রতি মুহূর্তে তুমি দর্শন দান কর।
তোমার 'আয়নায়ে বারি' যখন শেষ হল- তবে তোমারই স্মরণে যেন নিঃশ্বাস বের হয়।
এই নশ্বর জগত থেকে যেই নিঃশ্বাস চলে গেল- তবে তোমার নামের পরে 'আয়নায়ে বারি' শেষ হল।
আমি মনে মনে যখন সমাপ্তির তারিখ জিজ্ঞেস করলাম- তখন আহ্বানকারী বলে উঠল, এখন কাজ থেকে অবসর হও।
তোমার অনুগ্রহে 'আয়নায়ে বারি' যেন কবুল হয়- এটা মকবুলের প্রার্থনা যে, তুমি কবুল কর।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের মওলা আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা অনুসরণ করে। চিরস্থায়ী প্রশংসা সহকারে আমি খোদার প্রশংসা করি।
মাটির দেহ নুরে আহমদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা যখন উজ্জ্বল হল- তখন খোদায়ী সৌন্দর্য দর্শনের আয়না হয়ে গেল।
আয়নায়ে বারি খোদার কাছে কবুল হোক- ইহা পরমাত্মার নূর অনুসন্ধানে সহায়তা করুক এবং পাঠে উপকারিতা দান করুক।

১৪ই জমাদিউস সানি তারিখ মোতাবেক ১৩৩০ হিঃ রোজ বুধবার আসরের নামাজের সময় পরিপূর্ণতায় পৌঁছল এবং গ্রন্থ রচনার সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটল। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

উহা রচনা করেছেন অধম হীন দাস আবুল বারকাত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গণি (আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন) যিনি গণি, সাফী, অতঃপর মকবুল নামে পরিচিত।

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. *Quraan Shareef Online - পবিত্র কুরআন বাংলা অনুবাদ সহ, https://www.quraanshareef.org/. Accessed 13 December 2023.*

২. Rumi's Masnavi - Listen to this reed how it complains, telling a tale of separations—, http://masnavi.net. Accessed 11 December 2023.

৩. *قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات والمجالات - قاموس عربي عربي, قاموس عربي انجليزي ثنائي* https://www.almaany.com/. Accessed 28 December 2023.

৪. "حقیقت محمدیه و مقام پیامبر اکرم(ص) در عرفان اسلامی." 16 June 2023, http://sazedel.parsiblog.com. Accessed 9 December 2023.

৫. Rekhta Dictionary, 2 March 2023, https://www.rekhtadictionary.com/contact-us?lang=ur. Accessed 11 December 2023.

৬. *আল ইফাদাত শরহে মিরকাত*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৭. ফরহাদাবাদী, *সৈয়দ আমিনুল হক*. Translated by সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, ষষ্ঠ ed., তোহফাতুল আখইয়ার, ১৪২১ বাংলা.

৮. দেহলভী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ. *ফয়জুল হারামাইন*. Translated by মুহাম্মদ সরওয়ার, দারুল ইশাআ'ত.

৯. আভারসাজী, আলী. *ফার্সি-বাংলা-ইংরেজি অভিধান*. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক প্রজাতন্ত্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৮.

১০. হোসাইন, সৈয়দ দেলাওর. *বেলায়তে মোত্লাকা*. মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, ২০০৯.

১১. বাদাখশানী, মকবুল বেগ. *ফিরোজুল লুগাত*. ফিরোজ সন্স প্রাঃ লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান, ২০০৪.

১২. কাঞ্চনপুরী, মুহাম্মদ আব্দুল গণি. *কারামতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)*. Translated by বোরহান

উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর, আল-হারুন রিসার্চ একাডেমী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ২০০৬।

১৩. ভূঁইয়া, মওলানা ফয়েজুল্লাহ. *হযরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত*. আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ২০১২।

১৪. হোসেন, তাসাদ্দুক. *লুগাতে কিশওয়ারী*. আদাবী দুনিয়া, ২০১৯.

১৫. রুমী, মওলানা জালাল উদ্দীন. *মসনবী শরীফ*. Translated by কামাল আহমদ বাগী, বাগী কুঞ্জালয় পাঠাগার, ২০১৮.

১৬. রুমী, মওলানা জালাল উদ্দীন. *মসনবী শরীফ*. Translated by কাযি সাজ্জাদ হোসাইন, সব রঙ কিতাব ঘর, দিল্লী, ভারত.

১৭. সাদী, শরফুদ্দীন মুসলেহ. *বুস্তানে সাদী*. Translated by †গালাম হাসান, মুস্তাক আহমদ, লাহোর,পাকিস্তান.

১৮. সিরাজী, হাফেজ. *দিওয়ানে হাফেজ*. Translated by সাজ্জাদ হোসাইন, প্রগ্রেস বুকস, লাহোর, পাকিস্তান.

১৯. সাদী, শেখ মুসলেহ. *গুলিস্তা*. Translated by সাজ্জাদ হোসাইন, মকতাবা রহমানিয়া, লাহোর, পাকিস্তান, ২০০০.

২০. সোবহান, আব্দুস, translator. *করিমা*. কুহে নুর লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৬.

২১. আত্তার, ফরিদ উদ্দিন. *মানতেকুত্তায়ের*. Translated by আগা মুহাম্মদ আশরাফ, আল-ফয়সাল, লাহোর, পাকিস্তান, ২০১৮.

২২. জামী, আব্দুর রহমান. *নফহাতুল উনস*. Translated by সৈয়দ আহমদ আলী শাহ, শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর, পাকিস্তান, ২০০২.

২৩. রুমী, জালাল উদ্দীন. *মসনবী শরীফ*. Translated by শামসুল হক, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৩.

২৪. দেহলভী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস. *হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ*. Translated by আখতার ফারুক, ঢাকা, রশিদ বুক হাউস, 2008.

২৫. দেহলভী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস. *হামআ'ত*. Translated by মুহাম্মদ সরওয়ার, লাহোর, সিন্ধ সাগর একাডেমী, 1946.

২৬. দেহলভী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেস. *আল-কওলুল জামিল*. Translated by মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী, ঢাকা, রশীদ বুক হাউস, ২০১১.

২৭. হোসাইন, আলমগীর. *শরহু নুখবাতুল ফিকার*. ঢাকা, ইসলামিয়া কুতুবখানা.

২৮. রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর. *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*. ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫.

২৯. আল-ইয়ুসী, আল-হাসন. *কিতাবু জাহরিল আকম ফিল আমছাল ওয়াল হিকম*. vol. ২, মাকতাবা শামেলা. ৩ vols.

৩০. জামী, আব্দুর রহমান. *মসনবী হাফত আওরঙ্গ*. vol. 2, তেহরান, মরকজে মুতালেয়াতে ইরানী, ১৩৮৭ হি:. 2 vols.

৩১. সলিম, ইসমত আবু, translator. *আল-মানজিদ*. লাহোর, মাকতাবায়ে দানিয়াল

৩২. সুফয়ান, মওলানা আবু, and মওলানা ফজলুদ্দীন শিবলী. *ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ*. রশিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৮.

৩৩. Attar, Farid Uddin. *The Conference of the Birds*. Translated by Afkham Darbandi and Dick Davis, Penguin Books, 1984.

৩৪. "Jalal al-Din Davani." *Wikipedia*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jalal_al-Din_Davani. Accessed 25 December 2023.

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

